

শিষ্য...

শরীফ আবদুল্লাহ

উৎসর্গ-

টাকা খুব খারাপ জিনিস। জীবনটাকে
এর নিমিমে উৎসর্গ না করাই ভাল, তাই বইটাকে করলাম।



লেখা-১

কাঁচের দেয়াল আমি দেখি নি। ভাঙ্গা দেখেছি কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশের।
বাড়িতে বড়ো-সড়ো এক কাঠের টেবিল ছিল। সেটা ছিল আমার চোখের বিষ।
আর সেই বিষ এখন আমার সাধু !

তাকে এক রকমের গুরু মানি আমি। ডাবের নোনা শীতল জল কিংবা আঁখের
সহিত বরফ মিশ্রিত রস যেভাবে গাএকে শীতল করে তুলে, ঠিক তেমন আরাম
দিয়ে যায় তার দর্শন আমায়। কেউ প্রশ্ন করলে বলবো, জানি না কেন তা ! মাঝে
মাঝে মনে হয় এর শীতলতা কেবল আমার জন্যেই। তাই দীর্ঘ পথ হেটেছি
নেশার সমুদ্রের চারিধারে আর পেয়েছি অজস্র জ্ঞান। কুড়োনো জ্ঞান ভান্ডার আজ
হৃৎপিণ্ড, কলিজা, ফুসফুস সহ সমস্ত দেহে বিকট শব্দে খলখলিয়ে হাসছে। অক্লান্ত
হাসি তার। ক্লান্ত হয়ে হাসির প্রহর ক্ষান্ত হলেই নয়ন বুঝবো ভুবনের তরে।

তাই প্রতিজ্ঞা জীবন বাঁচানোর। নিজেকে বাঁচানো সম্ভব নয়, বাঁচাবো অন্য
কাউকে। যারা নেশার সমুদ্রের কাছাকাছি চলে এসেছে। কিছু খুঁজে পেতে চাচ্ছে
নেশার মাঝে। ডুব দিতে যাচ্ছে অন্ধকারের গহীন গুহায়। নেশা কষ্টকে ভুলতে
সাহায্য করে না, নিয়ে যায় না অন্য কোন ভুবনে ভ্রমণ করাতে, দিয়ে যায় না
কোন তিপ্ততা। সে কেবল মজা দিয়ে যায় প্রাপ্তিতে জীবনকে ছাঁই করে দেয়।
অদ্ভুত কর্মোকাণ্ড তার। তাই চাই কাঠিতে আগুন ধরার আগে নেভানোর সু-
ব্যবস্থা। সবাইকে না পারি কিছু তো পারবো, কিন্তু কীভাবে? ভাবনার মাঝে
ব্যঘাত দিল একজন। ‘চাচা, আগুন হবে আপনার কাছে?’ কণ্ঠটা
অত্যন্ত ভরা লোকটির, কোমলতাও রয়েছে। চোখ তুলে দেখলাম ঐ লোকটি।
কথা বলার আগে বুঝা কঠিন ভদ্র না অভদ্র। তাই ভদ্র অথবা অভদ্র লোকটি, যার
কাজকর্ম বহুদিন ধরে প্রদর্শন করছি।

বিশাল জনতার মিছিল সোহরাওয়ার্দীর উদ্যান। দিনের শেষ প্রহরে ছোট-
বড় সকলের আগমণ এখানে। তার সাথে বিশেষ আকর্ষণ নারী তো থাকছেই।
তাও আবার নানান রকম বাহারি কাপড়ে। কেউ ছোট ছোট কাপড়ে আবার বড়



সড় কাপড়ে, ছেলেদের অথবা বাচ্চাদের কাপড়ে, আবার কিছু কিছু নারীদের বোঝার উপায় নেই কোন ধরনের কাপড়ে এসেছে। সত্যিকারের বাঙ্গালি সাজের মেয়েরাও আসে এখানে। সন্ধে হলে জুটিদের দেখা যায় খেলা। আহঃ! সে কী খেলা। কেউ গাছের সাথে, ওড়নার নিচে কিংবা গভীর অন্ধকারে। পারলে সন্তান এখানেই প্রসব করে তারা। ভাগ্যিস সৃষ্টিকর্তা এমন ব্যবস্থা রাখেন নি। বড় ধন্যবাদ আপনাকে। ও...কেহ আবার আসে গাঁজা বাবা গ্রহন করতে। বেহাল কাভকারখানা। তাই বহুত মজা পেয়ে গেছি জায়গাটা। এই লোকটি, যে আমার কাছে আগুন চাইলো কিছুটা ভিন্ন ধর্মী। তার এত তাল-তামশা দেখার সময় হয়তো নেই। তার একটিই কাজ, বসে বসে গাঁজা খাওয়া। নিত্য দিন একটি গাছের নিচে বসে বিকেল চারটা হতে রাত দশটা পর্যন্ত সাধুর ভীমে থাকে। শেষে তাকে তুলে নিয়ে যায় এক বৃদ্ধ। লোকটির দিকে আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সে পূণরায় জিজ্ঞেস করলো - ‘একটু আগুন হবে?’

-‘না নেই, দুঃখিত!’ নেতিবাচক কথা শুনে চলে যেতে লাগলো। পিছু হতে বললাম - ‘তবে আগুন ধরানোর সরঞ্জাম আছে। চাইলে নিতে পারেন?’

পিছু ফিরলো না লোকটি। বোধ হয় অহংকারী। তাই আমিও তাকে উঠে দেবার চেষ্টা করলাম না। দোকানের দিকে অগ্রসর হলো সে। লোকটি এখানে আসার আগে তাকে অনেক সময় ধরে লক্ষ্য করেছি আমি। তার হাতের বারুদ কাঠি বেশ আগেই শেষ হয়েছিল। তখন গাঁজা বানানোর কাজে ব্যাস্ত ছিল সে। আর আমিও একটু চিন্তায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই তার আগমন। না আসারও কোন কারন ছিল না। তার সবচাইতে নিকটতম ব্যাক্তি বসে আমি। পাঁ আপনা-আপনি পাঁচ কদম দিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। ইতিমধ্যে ম্যাচ এনে স্টিক ধরিয়ে টানতে শুরু করেছে লোকটি। পর পর দুটি স্টিক ফিটারের মত শেষ করলো সে। স্থির করলাম তার সাথে কথা বলবো। তাই পাছের নিচ হতে যুগান্তর পেঁপারটি হাতে নিয়ে তার দিকে এগুলাম। অনুমতি ব্যতীত তার পাশে ঘাপটি মেরে বসে নিলাম। তার হাতে কিছু গাঁজা। সেগুলোকে কেঁট দিয়ে টুকরো টুকরো করেছে। এতে স্টিক খুব ভাল হয়। সুগার সাথে খুব সহজে মিশে যায়। আমি নিজ হতেই একটি সিগারেট নিয়ে ফলস বের করতে লাগলাম। সে আমার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো - ‘খাবেন না কী?’



কোন আগ্রহ না দেখিয়ে বললাম - ‘ইচ্ছে নেই, তবুও অবিচার করেছি বলে সঙ্গ দিতে আসলাম আপনাকে।’

- ‘কার সাথে অবিচার করেছেন?’

- ‘কেন আপনার সাথে, ঐ যে আগুন দিলাম না! কাজটা ঠিক হয় নি, তাই ভাবলাম আপনাকে একটু সঙ্গ দেই।’

খুব বিকট হাসি হেসে বলল সে - ‘গরু মেরে জুতো দান নাকি? এমন মানুষ আমার অপছন্দ। আর আমার সঙ্গ লাগে না। সঙ্গী কেবল একজন, সে নেশা!’ স্পস্ট কষ্ট তার কথার মাঝে। বললাম - ‘তাহলে আপনার সঙ্গী নেশা?’

- ‘অবশ্যই নেশা।’

একটু হেসে বললাম - ‘চলুন তবে আপনার সঙ্গীর সঙ্গী হব আজ।’

লোকটি বলল- ‘যদি আমার সঙ্গী আপনাকে গ্রহন করে অবশ্যই হবেন।’ মনে মনে বললাম, নেশা সকলকে গ্রহন করে। নেশার কাজ গ্রহন করা, বিবেক সম্পন্ন মানুষের কাজ বর্জন করা।

দুজনের সহিত কেবল আলাপই হল, নামের মোলাকাত হল না। কিন্তু বুঝতে পারলাম কোন এক কষ্ট আছে তার মাঝে। অবশ্য বেশির ভাগ মানুষই কষ্ট পেয়ে নেশাকে আকড়ে ধরে। লোকোটির মাঝে ঘনিষ্ঠতা কম। কারন নিজে হতে কিছু বলে না। লোকটি একরোখা অথবা অহংকারী আবার দুটিও হতে পারে। কে জানে আসলে কী, কিছুক্ষনের কথাতে কাউকে চেনা যায় না। দুজন খুব তাড়াতাড়ি স্টিক তৈরী করে ফেললাম। লোকটির দিকে তাকিয়ে আমি তার নাম জিজ্ঞেস করতেই সে বলল- ‘আমি মহিদুল ইসলাম সাজু। বাই দা বাই, আপনার নাম কী?’

- ‘খুব-ই ছোট নাম, শিষ্য।’

- ‘এটা আবার কেমন নাম হলো, আপনি কার শিষ্য?’

রহস্য নিয়ে উত্তর দিলাম - ‘আপনার হাতে এখন যিনি অপেক্ষা করছেন আমি তার শিষ্য। এখন অপেক্ষায় আছি তার দর্শন পাবার।’

কিছু বুঝলো না এমন এক ভাব নিল সাজু। পরে হাসির ভাব নিয়ে বলল - ‘চলুন তবে, আপনার গুরু ভক্তি সেরে ফেলি।’

আমিও বললাম - ‘চলুন। নিমাই হবে কিন্তু সাজু।’ সাজু বলল - ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, মো প্রোবলেম শিষ্যদা।’



লেখা-২

একটি প্রবাদ রয়েছে, “ডোবা দেখলে ব্যাঙ লাফায়”। তাই সাজু ব্যাঙটাকে লাফানোর ব্যাবস্থা করতে হবে। গাঁজা সাজুর জন্যে ডোবা সদৃশ। গতদিন পরম শান্তিতে সিদ্ধি গ্রহন করেছি সাজুর সাথে। সে গাঁজা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। কেবল জানে, এটি হাতে ডলে, ফলস এ ভরে শুধু গিলতে হয়। তাকে গাঁদা ফুলের গাছ দেখিয়ে যদি বলা হয় এটি গাঁজা গাছ সে তা-ই মানবে। কারন গাঁজা আর গাঁদা গাছ দেখতে একই রকম। গাঁজার স্ত্রী গাছের পাতা দিয়ে আমরা নেশা করি। এ জন্যেই তো নেশা হয় মারহাবা। পুরুষের কোন দাম নেই এ রাজ্যে।

সাজুর সাথে অনেকটা ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমার। তাকে দিয়েই শুরু করবো আমার অভিযান। সোহরাওয়ার্দীর ভিতরে আমি। সাজু তার নিত্য দিনের স্থানে বসে ডলাডলি করছে। তার পাশে আরো অনেকেই ডলাডলিতে মগ্ন। এই ডলাডলি জাতি নিয়ে একটি হোটেল খোলা যেতে পারে। নাম দেয়া যেতে পারে ‘ডলাগাঁজা হোটেল’। হোটেল এ থাকবে, গাঁজা পরোটা, গাঁজা মামলেট, গাঁজা পুরি, গাঁজুরা (পাকুরার গাঁজা নাম) এবং ডলা গাঁজা। টি.ভি তে ডলাগাঁজা হোটেল সম্পর্কে একটি এ্যাডও দেয়া যেতে পারে। এ্যাডয়ের টাইটেল থাকবে “আপনি কি গাঁজা ডলা নিয়ে ভুগছেন? আর চিন্তা নয়, এখন-ই চলে আসুন আমাদের কাছে। আমাদের ডলাগাঁজা হোটেল-এ পাবেন, গাঁজার তৈরী খানা এবং ডলা গাঁজা। নতুনদের জন্যে গাঁজা ফাটানোর সু-ব্যাবস্থাও রয়েছে।” যেন আমায় দেখলো না এমন একটি ভাব সাজুর মুখে। আমি কাছে গিয়ে নিজ হাতে বললাম - ‘কেমন আছেন সাজু?’

একটু উত্তেজিত হয়ে বলল - ‘ও...আপনি, তারপর কী খবর বলুন!’

- ‘চলছে, আপনাকে ভাল লেগে গেল তাই আবার চলে আসলাম।’

- ‘ধন্যবাদ।’

- ‘আচ্ছা সাজু, একটি কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। গত সারারাত কী খাটা মাথাতে ফুটবল খেলেছে।’

- ‘বলুন, কি জানতে চান?’

আমি সাধুকে ডলা দিতে দিতে বললাম - ‘আপনি কাল আমার প্রথমে চান্স বলেছেন, কেন বলেছিলেন?’



-‘কিছু মনে করবেন না দাদা। আপনার মুখের দিকে তাকালে খুব হাসি পায়। আর শরীরটাও বানিয়েছেন কাওরান বাজারের কালুর মত। তাকে চাচা বলি, তাই আপনাকেও বলে ফেলেছি। এজন্যে এক্সট্রেমলি সরি!’

-‘কালুটা কে? সাজু হাসিমুখ করে বলল -‘পোলটা ম্যান। গাঁজার পোলটা সাপ্লাই দিয়ে থাকে। ফোনেও অর্ডার নেয় সে। তার শরীর দেখলে মনে হয়, প্যান্টের নিচেরটাতেও ব্যাল্ট পরে। আপনাকেও তাই মনে হয়েছিল, পিনিকে বলে ফেলেছিলাম তাই।’

চুপ হয়ে গেলাম। নিজের সম্পর্কে বাজে কথা শুনলে রক্ত কাঁপে। জানি নিজেকে কঙ্কালের মতই লাগে। সাধুকে ভক্তি করতে করতে এমন অবস্থা। নিজেকে আয়নাতেও দেখা হয়না বহুদিন। দেহের এ অবস্থা চোখ সহ্য করবে না। তার উস্কানিতে দেহ আত্মহত্যা করতে পারে। আমি বাঁচতে চাই, নেশাকে না বলতে চাই। পারি না, জানি পারবোও না। তাই বলে সাজু ব্যাটা এমন একটি চিন্তা করবে আমাকে নিয়ে? ইচ্ছে করছে পাঠার মত বলি দিতে তাকে। পাঠা বলি দেয়া নিয়ে একটি রম্য গল্প শুনেছিলাম, শয়তান নাকি ওমর (রাঃ) কে দারুন ভয় পেত। তিনি যে পথ দিয়ে চলাচল করতেন সে পথে শয়তান ভুলেও যেত না। একদিন শয়তানের বড় ছেলের বেশি হাগা রোগ হলো। পেটের ব্যাথায় কুপকাত হবে হবে ভাব। ছেলে বাবাকে বলল -‘আর পারি না পিতা। ব্যাথায় পরান যায়! আপনি কেন যে শয়তান হতে গেলেন? আপনার দোষে আমার আজকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে। মহান আল্লার পাঁ ধরে মার্জনা চান পিতা, আমাকে ব্যাথা থেকে মুক্ত করেন।’ শয়তান নিজেকে খুব ছোট ভাবতে লাগলো। মনে মনে বলল -‘বড় ছেলের মুখ থেকে এত কঠিন কথা শুনতে হলো আমাকে? আমি আল্লার কাছে মার্জনা প্রার্থনা করবো? কোন দিন না।’ শয়তান তখন-ই বাসা হতে বের হয়ে পড়লো। তার পরিচিত একজন হেকিম ছিল, তার খোঁজ করতে লাগলো। জানতে পারলো হেকিম সাহেব একটি পাহাড়ে ধ্যানরত অবস্থায় মগ্ন। সেই পাহাড়ে যাবার মাএ একটি পথ, বিকল্প কোন পথ নেই। শয়তান সেই পথ ধরে এগুতে লাগলো। হঠাৎ পথের মাঝে ওমর (রাঃ) কে দেখতে পেল শয়তান। তিনি ঐ পথ ধরে আসতে ছিলেন। শয়তান কোথায় পালাবে দিশে হারিয়ে ফেললো। আল্লার হুকুম না পেয়ে ছাগির (পাঠি) রূপ ধারণ করে বসলো। ওমর (রাঃ) হুকুম থেকে বের হলো পেয়ে গেল সে কিন্তু পাঠাদের হাতে ধরা খেল। শয়তান তখন পাঠিতে রূপ নিল।



পাশেই দুইটা ভিলেন পাঠা ছিল, তাঁরা শয়তানকে ধর্ষন করে পালালো। শয়তান কিছুই করতে পারলো না কারন ওমর (রাঃ) তখনও ঐ পথে ছিলেন। তিনি চলে যাবার পর শয়তান নিজের রূপ ধারণ করলো। রাগে তার শরীর জ্বলে উঠলো। শয়তান কিছুতেই তার ধর্ষনকারীদের খুঁজে পেল না। পরে কিছু বে-ধর্মীদের উদ্দেশ্যে বয়ান দিয়ে বলল -‘আপনারা পাঠা বলি দিবেন। এমন ভাবে দিবেন যেন এক কোপে কল্লা পড়ে যায়, পাঠা হলো আমার চোখের বালি, আমাদের শত্রু। সেই থেকে নাকি পাঠা বলি শুরু হলো। আজগোবি ঘটনা সব, হিন্দু ধর্মকে এভাবে ছোট করা ঠিক না। আমি গল্পটা শুনে লোকটাকে চর বসিয়ে দিয়েছিলাম। কিছু পাজি লোকদের জন্যে আমরা ধর্ম ধর্ম করে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। তবে এই মুহূর্তে সাজু পাজিটাকে বলি দিতে পারলে আরাম পেতাম।

সাজু বলল -‘দাদা নিন, আপনার গুরুকে ভক্তি শুরু করুন।’ আজ বাঁশি বানিয়েছে সাজু। অনেক আয়োজন করতে হয় বাঁশি বানাতে। গুলটি, হাঁদাপাতা, ছোবা আরো কত কি ভীজিগীলি! এটা নেশাখোরদের যুগান্তরকারী সৃষ্টি। তাদেরও বিজ্ঞানী বালা যেতে পারে এটা সৃষ্টির জন্যে। টান দিতেই ফর ফর করে ধূয়া বুকের মাঝে প্রবেশ করলো। বন্ধের গহবরে ধূপ...ধূপ শব্দটা কর্নে আঘাত করছে। চারিদিক অতি শান্ত ঠিক আমাদের মত। ঝিম ঝিম অনুভূতি। যেন এক খোলা সমুদ্র। বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছটফট করছে চুল বাতাসে। পাঞ্জাবি ঘুড়ির মত ভাসছে। বলতে ইচ্ছে করছে, ক্যামেরা ম্যান একটি ছবি খীচো। মস্ত কের শিরাগুলো তাই ভাবতে চাইছে। মাঝে মাঝে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্তিকার দিকে, ভালবাসারটানে জরিয়ে ধরতে। দশ মিনিটকে মনে হচ্ছে এক ঘন্টা। আহঃ! কি পরম শান্তি। আহঃ! দেহের মাঝে কি শীতলতার অবাধ চলন। এভাবেই ধীরে ধীরে আসছে আমার মরন!

নেশার দাপটে অনেক সময় পর্যন্ত আমরা মুখকে কথা বলা হতে বিরত রাখলাম। জড়ানো কণ্ঠে সাজু জিজ্ঞেস করলো -‘হ্যা, তারপর বলুন শিষ্যদা আপনার শিষ্যের রূপান্তরের গল্পটা?’ একটু গম্ভীর মুখে বললাম -‘গল্প কিছু নেই।’ -‘তাহলে নিজেই নিজের নাম রেখেছেন, তাই তো?’ রাগ ভরা কণ্ঠে বললাম -‘সাধু আমার নাম রেখেছেন। তিনিই আমার দাবা’ -‘সাধুটা কে বলুন তো, স্পষ্ট করে বলুন?’



-‘সাধু হচ্ছে নেশা, বিশেষ করে গাঁজা !

সাজু হো হো করে হেসে উঠলো, যেন বিশাল এক কৌতুক শুনলো সে। পাশে বসে থাকা কয়েকজন লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে, আবার ডলাডলির কাজে লেগে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম -‘হাসছেন কেন?’

-‘হাসবো না তাহলে ? আপনি বলছেন, নেশা আপনার সাথে কথা বলে, আপনাকে গান শুনায়।’

বললাম -‘গান শুনায় কে বললো ?’

-‘আপনি বলেন নি, আমি-ই ধরে নিলাম। যে কথা বলে, সে গানও শুনতে পারে। হোক তা তালহীন।’

-‘হ্যাঁ পারে, তবে নেশা শুনায় না।’ সাজু খুব মজা পাচ্ছে এমন ভাবে জিজ্ঞেস করলো -‘তাহলে কি কথা বলে আপনার সাথে ? তার দুঃখের কথা, বিবাহের কথা, সন্তানদের নেশা করার কথা ? হে হে, কি বলি। মাথা তো আমারও গেছে বিন্দাবনে। তাদের সন্তানরা কিভাবে নেশা করবে ! বুঝতে পারছি দাদা, নেশায় ধরেছে আমাদের। দুজনই ফালতু বকছি, পিনিক, দাদা পিনিক।’

এমনিতে সাজুর উপর মন খারাপ হয়ে আছে, তার উপর তার রম্য কথাগুলো খুব বিরক্তির সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে সাজুকে বললাম -‘একটি সিগারেট দিন সাজু। ভিতর এখন নিকটিন চাচ্ছে।’

-‘দাদা দুঃখিত সবগুলো পাইলট সিগারেট, ফলসয়ের জন্যে আনা। এগুলো ছাড়া অন্য সিগারেট নেই !’ আরো বিরক্ত হয়ে বললাম -‘কেন আপনি সিগারেট খান না ?’

-‘না দাদা।’ দাঁত বের করে বলল।

-‘ও...ভালো। পিছন দিয়ে তো সব আঙ্গুল ভরেছেন, বুড়োটাকে বাদ দিলেন কেন ! সাজু বুঝতে পারলো ক্ষেপে গেছি আমি। শান্ত গলায় বলল -‘দাদা, যদি একটু নিয়ে আসতেন।’

-‘হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি।’

সাজুর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমার। মান অভিমানের পর্যায়েও এর মাঝে এসে পড়েছে। দোকানের দিকে সিগারেট আনার উদ্দেশ্যে হাটছি। সাজুকে কীভাবে বের করা যাবে নেশা হতে। যে সিগারেট খায় না, তার নেশায় আসক্ত হওয়া অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু সেখানে সাজু সার্থক পুরুষ। কীভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করবো আমার নেশা বিমুখ অধ্যায়। বাঁচাবো কীভাবে তাকে ? পৃথিবীর চিন্তা



নিয়ে হাটছি। কিছুক্ষণের জন্যে আমি -সাংবাদিক, গোয়েন্দা, প্রাইভেট এজেন্ট আরো কত কি হবার চেষ্টা করলাম। মাথায় চলে এলেন বুদ্ধি বাবা। চট করে বলে গেলেন সুন্দর এক বুদ্ধি। হাসি মুখে সিগারেট না কিনেই ফিরে এলাম সাজুর কাছে। আয়না থাকলে নিজেকে একটু দেখে নিতাম কেমন লাগছে। না থাকাতেও কোন সমস্যা হলো না। সাজুই মুখের বিবারণ দিল -‘কি হলো, একেবারে জোছনা মুখ নিয়ে ফিরে এলেন?’

-‘হ্যাঁ। দেখি একটি পাইলট দিন তো।’ সাজু পাইলট সিগারেট দিল। অতি যত্নের সহিত তাকে হাতে নিলাম। শত হলেও সম্মানিত এক নাম, সম্মান তো প্রদর্শন করতেই হবে। গুরুজনের ভক্তি আত্মার সন্তি। সিগারেটে সুখটান দিয়ে সাজুকে বললাম -‘আপনি সাধুর সাথে কথা বলতে চান সাজু?’

মুখে মজা নিয়ে বলল -‘সিগর চাই। তার খোঁজ খবর নেয়া তো আমারও কর্তব্য। আপনি কেন একা একা নিবেন দাদা?’

দরদ মাথা গলায় বললাম -‘আমি একদমই মজা করছি না। শুনুন সাজু, আমার মৃত্যু অতি নিকটে। শরীরের সবকিছুই প্রায় নিঃশেষ। সকল কলকবজ্জা জিহ্বা বের করে হাপাচ্ছে। এখনই শশুর বাড়ি যাই অবস্থা। আপনাকে ভাল লেগে গেছে সাজু। আপনার সাথে সাধুকে নিয়ে আড্ডা দিতে চাই।’

সাজু এবার আমার কথা কানে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো -‘আপনি কি সত্যি নেশার সাথে কথা বলেন?’

-‘হ্যাঁ, বলি। তিনি আমার নাম ধরে ডাকেন। অমৃত কণ্ঠ তার, যখন নাম ধরে ডাকেন, দেহ দূরন্ত শান্তি পায়।’

-‘ওহ সিট, হাউ ইজ দিস পসিবল?’

-‘অনেক কিছুই সম্ভব সাজু।’ সাজু একটু আগ্রহ নিয়ে বলল -‘কিন্তু কীভাবে শিখ্যাদা?’

-‘তবে শুনুন,

তখন আমরা চার জনই তাগড়া যুবক। বাড়ন্ত বয়স, রসালো যৌবন। তবে এই যৌবন কোন মেয়ের জন্যে ছিল না, ছিল একমাএ নেশার! নতুন নতুন চোখ ধাঁধানো কু-শিক্ষার বয়স যাকে বলে। এ বয়সে কালো শিক্ষণ্ডলো অষ্টপদীর জালের মত টেনে ধরে। আমরা চার বন্ধুও তেমন জালের শিকার হয়ে পড়লাম। আজ ছাড়া পাবো কাল ছাড়া পাবো করতে করতে, নেশা হয়ে পেলি বাঁচার হাতিয়ার। যখনই নেশা দেহে প্রবেশ করতো আমরা পৃথিবীর সকল সুখ পোতাম।



ক্রমে ক্রমে নেশা নিয়ে পড়তে লাগলাম। জানতে লাগলাম নতুন কোন উপায় নেশাকে গ্রহন করার। সব ধরনের নেশাই আমরা সেবন করতাম। তবে, গাঁজার অতীত আমাদের আকর্ষণ করে ফেললো। জানতে পাড়লাম, গাঁজা নিয়ে নেদারল্যান্ডের আমস্টারডামে মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে। এই ক্ষুদ্র গাছের অনেক পাওয়ার। সে মারাত্মক হেলুসিনেটিং ড্রাগ হিসেবেও কাজ করে। এই হেলুসিনেটিং এর ফলে হাত, পাঁ, চোখ, দাঁত এমনকি যৌনাঙ্গ বড় হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। আমরা বিধাতার অঙ্গ বড় বানানোর চেষ্টায় লেগে পড়লাম। মানতে লাগলাম গাঁজা নেশার গুরু। তার সৃষ্টিই নিজ রাজত্ব বৃষ্টিতীর জন্যে।

নানান ভাবে নানান উপায়ে গাঁজা সেবনে আমরা দক্ষ্য হয়ে পড়লাম। বাঙ্গপাতার সাথে দুধ জাল দিয়ে, টিকটিকির লেজকে শুকিয়ে মিশিয়ে, চিনি মিশিয়ে, গাঁজার সাথে রক্ত, বোতলে ভরে, পানিতে মাথা ডুবিয়ে পাইপ দিয়ে, নিজেদের গুঁ শুকিয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন কারুকাজ করে খাওয়া শুরু করলাম। তবে দেহের কোন অঙ্গই বড় হবার মজা পেল না! হতাশ হয়ে পড়লাম সবাই। একদিন বন্ধু মাসুদ (বুয়েটের ছাত্র ছিল) বলল, সে আবিষ্কার করবে গাঁজার এক নতুন দুনিয়া। যেখানে মস্তিষ্ক নিজের পরিচিতি হারাবে। এটাও এক ধরনের হেলুসিনেটিং। তবে হাত, দাঁত অথবা যৌনাঙ্গ বড় হবে না। এই হেলুসিনেটিং কিছুটা নিম্ন মানের। এর মাধ্যমে নেশার সাথে কথা বলা সম্ভব।

আবিষ্কারের জন্য মানুষ উন্মাদ হয়ে পড়ে। নিজ লক্ষ্যে পৌছানোই হয়ে পড়ে তার মুকুট। আমরাও মুকুটের পিছু ছুটতে লাগলাম। নেশা বেড়ে গেল রকেটের গতিতে। আমাদের আশ্রয় চেষ্টা, মাসুদের চিকন বুদ্ধির সাথে একত্রিত হয়ে নতুন পদ্ধতির জন্ম দিল।

সাজু অতি আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করলো - ‘আবিষ্কারটা কিভাবে কাজ করে দাদা?’ কথা বললাম না। কিছু বাকি রাখা ভাল, নইলে আকর্ষণের থাকবে কি? দীর্ঘ অক্লিষ্টে নিলাম দেহে। কথার মাঝখানে কতগুলো স্টিক খেয়েছি কে জানে! সাজু বারে বারেই পদ্ধতিটার কাজ-কর্মের বিবরণ শুনতে চাচ্ছে। আমিও আকর্ষণ আর নিজের ভান্ডারে রাখতে পাড়লাম না। মানুষের ধর্মই এমন, নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে সকলকে বলতে প্রস্তুত। একটিই কারণ, প্রশংসা। বললাম, ‘সাজু, এটি গ্রহণের কিছু শর্ত রয়েছে। এগুলো মানা আবশ্যিক, অন্য শর্ত যতো বর্ণনা



পাঞ্জাবি পরিধান করা। ২য় -চোখে সুরমা দেয়া। এবং ৩য় শর্ত -অজু করে পাক পবিএ হওয়া।’

অবাক গলায় প্রশ্ন করলো সাজু -‘অজু করতে হবে কেন ? পাগল নাকি !’
-‘পাগলই বলতে পারেন মাসুদকে। দুনিয়ার সব নাস্তিকদের প্রধান সে। একরোখাও ছিল ছেলেটা। তাই যা বলতো তাই মাথা পেতে নিতে হতো। না নিলেই ধাপুস-ধুপুস কিল। তার কথা, পবিএ শরীরে মন সজীব থাকে, তাই নেশা সেবন কাজে দেয় বেশি।’

সাজু হালকা কণ্ঠে বলল -‘কী অদ্ভুত...!’

-‘হ্যাঁ অদ্ভুত। আর শেষের শর্ত হল, নেশা সেবনের পরে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ নিরবতা পালন করতে হবে। এই নিরবতাই আপনাকে নেশার সাথে কথা বলতে সাহায্য করবে।

সাজু হা করে বসে। উজ্জল চোখ তার ঝিকমিকি করছে। কিন্তু মুখের ভাবটা অতি বিদগ্ধটে। মনে হচ্ছে, মাএ গু ঝিল হতে আগমন হলো তার। চোখ বন্ধ ছিল বলে চোখটা উজ্জল। সাজু ঠোট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বলল -‘দারুন তো দাদা।’

-‘কি গু?’

-‘আরে না, আপনাদের আবিষ্কার। কবে নিচ্ছেন আমায় বলুন?’

- ‘চাইলে কাল।’

সাজু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল -‘ওকে, ডান। তাহলে কাল আপনার বন্ধুদের সাথে দেখা হচ্ছে দাদা?’

মনে হল, কিছু একটা খুব জোরে ধাক্কা দিল। নিজ হতেই মুখের মাধুর্য বিবর্ণ হয়ে উঠলো। চোখ ঝাপসা হয়ে কল্পনাতে নিয়ে গেল আমায়। সেই বন্ধুদের মুখ, হাসি ভরা দিন, একটি কাল রাত। সব কিছুর জোগাড় হয়ে গেছে। রাতে হবে আমাদের তৈরি “ম্যাজিক সাধু” দর্শন। ঢাকাতে আমি একা থাকি। তাই আমার বাসার স্থান ঠিক করা হল, সাধু দর্শনের জন্যে। মাসুদ, হামিদ, রফিকুল আর আমি সবাই ব্যাস্থ রাতের জন্যে। বিকেলে হামিদ সবার আগে এসে উপস্থিত। মাসুদ আর রফিকুল দুই ভাই এক সাথে এলো।

রাতের আসরে বসলাম আমরা। সবাই শর্ত পালন করেছি। মাসুদ নিজ হাতেই তৈরি করলো ম্যাজিক সাধুকে। যত্নের সহিত গ্রহণ করলাম। চোখের শর্ত



পালন করে চোখ খুললাম সবাই। কিন্তু মাসুদ খুললো না। সকলে তার দিকে তাকিয়ে। তাকে মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। মাসুদ বিল বিল করে কিছু বলছে। কর্ণকে তার কথার দিকে আকর্ষণ করিয়ে শ্রোতা হলাম। জানলাম, আমরা যা জানি তা ভুল। রফিকুল তার আপন ভাই না। মাসুদের মার মৃত্যুর পরে, রফিকুলের মাকে বিয়ে করে তার বাবা। কত অবহেলাই না সহ্য করেছে মাসুদ। চোখ খুললো সে। তাকে ক্ষুধার্ত হায়নার মত লাগছে। কেউ কিছু বুঝার আগেই রফিকুলের গলা চেপে ধরলো মাসুদ। বাঁচাতে পারি নি রফিকুলকে। অন্য কেউ ভর করেছিল মাসুদের মাঝে। ভয়ে পালাতে লাগলাম সবাই। পালাবার পূর্বে ম্যাজিক সাধুকে মাসুদ-হামিদের অজান্তেই নিয়ে এলাম আমি। কে কোথায় পালালো জানি না। তাদের সাথে দেখা হয় নি আর। দেহে একটু ধক্ক লাগলো - ‘কি হলো দাদা, কোথায় হারালেন?’

নিজেকে সামলিয়ে বললাম - ‘নাহ, কোথায় হারাবো। ভাবছি ওরা থাকলে খুব মজা হতো। কিন্তু কেউ আসবে না। সবাই ব্যস্ত আর রফিকুল মারা গেছে।’

- ‘দুঃখিত দাদা!’

ঘটনা লুকিয়ে নিলাম। কেন বারতি ঝামেলা ঘাড়ে নিব। সোহরাওয়ার্দীতে অন্ধকার নেমে এসেছে। নির্মল হাওয়া বইছে। সেই সাথে সাথে নারী-পুরুষের ধস্তা-ধস্তির সিনেমা শুরু হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের অশ্লীল কর্মকাণ্ড। আধারের নির্জনতায় পুরুষদের হিংস্রতা। বাজে অবস্থা জাতির! তবে, বাজে অবস্থা দেখতে সবার দারুন লাগে। একেবারে রসে ভরা রসোগোল্লাহ। আজ দেখতে মন টানছে না। উঠে দাড়ালাম। সাজুকে বললাম - ‘বিদায়, কাল দেখা হবে।’

- ‘চলে যাবেন, ঠিক আছে যান। কালকে তাহলে আপনার সাথে যাচ্ছি।’

চলছি, প্রানচঞ্চল পথ আজ। অনেক মিথ্যে কথা রেখে আসলাম সাজুর কাছে। নেশার সাথে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নেশা কেবল আমার সাথেই কথা বলে। এজন্যেই আমি শিষ্য।

অনেক মিথ্যে কথা নিয়েই আমাদের জীবন। মিথ্যা সপ্ন আর বাস্তবের মিথ্যে পথ বারে বারেই ভ্রান্তির সৃষ্টি করে আমার মাঝে। আচ্ছা, আমি কী সত্যিই নেশার সাথে কথা বলি, নাকি নিজের মাঝে নিজেই তৈরি করেছি এমন এক সত্য! নিঃসন্দেহে আমার কখনোই ত্যাগ করতে চায় না। শত ভুল করলেও কেন মনে হয় সে



সঠিক। সাজুকে নিয়ে কি কোন ভুলের দিকে এগুচ্ছি ! কীভাবে সাজুকে মুক্ত করবো ? ম্যাজিক সাধুর কি এমন কোন দিক রয়েছে ? বিপাকের মাঝে সাঁতার কাটছি আমি। বারে বারে মাসুদকে মনে পড়ছে। কথা বলছে সে কিন্তু অস্পষ্ট। ও ম্যাজিক সাধুকে নিয়ে কিছু বলছে। ম্যাজিক সাধু নাকি মাঝে মধ্যে এলএসডি ড্রাগ হিসেবে কাজ করে। পূর্বের কোন কষ্টদায়ক স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় সে। অলীক আত্মার জন্ম দেয় দেহে। আত্মা মাথার চিন্তার শক্তিকে নিঃস্তুজ করে দেয়। গাঢ় হ্যালুসিনেশন যাকে বলে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে পড়ে সে। যতক্ষণ নেশা থাকবে তার পুরনো খারাপ স্মৃতি গুলো দুমড়ে মুছড়ে দিবে তাকে। বিল বিল করে নিজের সাথে কথা বলবে। নিজেকে খুন করতে চাইবে। পাশের সবাইকে মনে হবে তার শত্রু। অধিক পেরেশানের পর যখন তার নেশা দ্রবীভূত হবে তখন সে এক সুস্থ মানুষ। তার মাঝে তৈরি হয়েছে ভয়। এই ভয় হয়তো দিবে নতুন এক জীবন। কথাটা মেনে নেবার মত না, তবুও এখন মানছি।

এ ধরনের হ্যালুসিনেশনের জন্যে ম্যাজিক সাধুকে নাক দিয়ে গ্রহন করতে হবে। বিপদজনক ব্যাপার। কাঁটা আচ্ছন্ন পথের পরে পানি থাকলে, পিঁপাসা মিটানোর জন্যে পাঁ একটু কষ্ট করলে দোষ কিসের। মাসুদ কি তাহলে সেদিন নাক দিয়ে গ্রহন করেছিল সাধুকে ? কিন্তু কখন, সকলে নিরবতা পালনের সময় নয়তো, হতেও পারে।

লেখা-৩

প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে গাঁজাকে মনে রাখতে হবে। ২৫০০ বছর আগে চীনে এর প্রথম অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা হয়। এক সময় তাকে ধর্মীয় গাছ হিসেবে মনে করা হতো। ইনি হলেন ভেষজ উদ্ভিদ। ব্যাথা নাশক, ক্ষুধা মন্দা, মাইগ্রেন এর ব্যাথা দ্রবীভূত সহ অনেক কাজে ব্যবহার করা হতো। তারা হয়তো জানতো না, যে উপকার করবে তারও কিছু চাহিদা আছে। গাঁজার চাহিদা হলো, সে মানুষের দেহে গাঁজা সাইকিস নামে একটি রোগের কামনা করে। অনেক দিন ধরে গাঁজার সাথে মিলন ঘটালে রোগটি হয়, উদাহরণ-আমি। অনেক রাজা-বাদশাহরা তেলের সাথে গাঁজা মিশ্রিত করে শরীরে মাখতেন। এতে কি উপকার হতো তা জানতে পারি নি। নিজেও কয়েকবার মেখেছি। অনেকে মৃত দেহের সাথে গাঁজাকেও সমাধি দিত। পরকালে নেশার কাজে ব্যবহারের জন্যে আদিম মানুষের আজগোবি কাজকর্ম।



ব্যাস্ত কিছুটা আমি। আজ সাজুকে মুক্তি করবো অভিষাপ থেকে। জোর দিয়ে বলতে পারছি না কথাটা। তবে সমর্থ অনুযায়ী চেষ্টা। সকাল হতেই কেমন যেন উতলা আকাশটা। ঝাপসা গরম আর দক্ষিণা বাতাস। দুজন নিজেদের মধ্যে আপস করতে পারছে না। তাদের দাঙ্গা, শরীরকে শান্তি দিচ্ছে না। তাই বাসা হতে বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তার ধুলা মাঝে মাঝে গান গেতে পারে। অনেক মায়া তার সুরে। গায়ক ধুলাগুলো আমার শরীরে প্রবেশ করছে। কাতুকুতু দিয়ে বলছে, আমাদের সাথে গাও! তাদের অত্যাচার সহ্য হলো না। সুরেরা বেশ কয়েকটি গান বেসুরের সহিত গাইতে গাইতে, চলে এলাম উদ্যানে।

একা অপেক্ষা আমার প্রিয় জিনিসের একটা। সকল ইন্দ্রিয়কে কাজের ছুটি দিয়ে দেই তখন। মুরগির মোরগ হয়ে ঝিমাই। সিগারেট খেতে হবে, তাই কুত্তা ঝাঁকি দিয়ে ঝিমটাকে বাতাসে ভাসালাম। সাজু আসছে, আমি অবলা হলে তার প্রেমে পড়ে যেতাম। পাঞ্চবিতে তাকে কুয়াশার মত সুন্দর লাগছে। সিগারেট ধরিয়ে একটি টানের মাথায় পাশে বসলো সে। বললাম -‘রাত বোধ হয় ভাল কাটে নি, তাই না?’

হাই তুলে বলল -‘হ্যা দাদা, ঠিক ধরেছেন। কিছুদিন ধরে ভয়ঙ্কর সপ্ন দেখছি। সপ্নগুলো অতি মায়ায় ভয়ঙ্কর।’

-‘কেমন সপ্ন?’

সাজু গাঁজা বের করতে যাচ্ছে। খারাপ ধরনের গল্পের জন্যে মানুষ কিছু সময় নেয়। গল্পটাকে গুছিয়ে নেবার জন্যে। সময়টা তার কথাগুলোকে সাজিয়ে তুলে তখন। সাজুকে সময়টা না দিয়ে বললাম -‘এখন স্টিক না খাওয়া ভাল। এতে কাজের ব্যাঘাত ঘটতে পাড়ে।’

-‘ওকে, তবে খেলাম না। সপ্নটা শুনুন বলি।’

-‘যেতে যেতে বলবেন, সময়টা ভাল কাটবে তাহলে!’

-‘ঠিক আছে, চলুন তবে উঠি।’ উদ্যানের বহিঃমুখে রওনা দিয়েছি। ভেবেছিলাম সাজু জানতে চাইবে না আমি কোথায় থাকি। না চাইলে তাকে খুব বোকা মনে হতো। কিন্তু বোকামিটা করলো না -‘ওহ, একটি কথা তো জানাই হলো না দাদা, আপনি কোথায় থাকেন?’

তার দিকে তাকিয়ে বললাম -‘একটু অপেক্ষা করুন জেলে যাবেন।’



হাতের ইঙ্গিত পেয়ে সিএনজি এসে থামলো। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো - 'কৈ যাইবেন মামা ?'

- 'মিরপুর-১, বেরিবাঁধ।'।'

- 'যামু, তয় তিনশো ট্যাকা !'

- 'চলো।'।'

আমার দিকে তাকিয়ে সাজু। চোখে অনেক কথা। সি.এন.জি চালক কিছু খেয়েছে মনে হয়। উল্কে পাক্কে চালাচ্ছে সে। বাঁকিতে সাজুর কথাগুলো সোজা পথ খুজে পাচ্ছে না, তাই সে চুপ। জিজ্ঞেস করলাম - 'কিছু বলছেন না কেন, চুপ হয়ে আছেন যে, মিরপুর বেরিবাঁধে গিয়েছেন কখনো ? ঢাকার গ্রাম ওটা, জানেন তো !'

- 'আপনি তো অনেক দূরে থাকেন।'।' রহস্য জরিয়ে কথাটা বললো সে। তাই বুঝতে পাড়লাম না কথার ধরনটি।

- 'হ্যা, সুস্ত পরিবেশে মানুষ অনেক দিন বাঁচে, তাই আর কি। মরতে খুব ভয় লাগে, বুঝলেন সাজু !

- 'আগে বলেনি কেন ?'

- 'এমনি, চলুন পরিবেশটা ভাল লাগবে। সাঁতার জানেন তো ?'

- 'কেন ?'

- 'ওখানে গিয়ে নৌকাতে পাড় হবো আমরা। ছোট খাটো নৌকা ভ্রমনও হলো আপনার। সাতার না জানলেও অসুবিধে নেই, আমি জানি। তবে চিন্তাতে আছি !' ভ্রু কুচকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সাজু - 'চিন্তায় আছেন কেন ?'

- 'আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি না ডুবে যাই। আমার থেকে আপনার ওজনটা বেশি মনে হচ্ছে।'।'

দুজনে হেসে উঠলাম। হাসি নিয়েই গন্তব্যে চলে এল সি.এন.জি। চালক নেশা করা ছিল না, ভুল ভেবেছিলাম। নেশা করতে করতে এমন হয়ে গেছি। মাঝে দেখি, মনে হয় নেশাখোর। পুলিশ যেমন সবাইকে চোর মনে করে, ব্যাপারটা তেমন ! বেরিবাঁধের যৌবন সাজুকে মুগ্ধ করেছে। তার আশ্রিত নতুন গ্রাম দেখা মানুষের মত, খালি পায়ে হাটা উদাস বালকের মত কিংবা বৃষ্টির সাথে খেলা করা শিশুর কঁচি হাতের মত লাগলো। নৌকাতে উঠতে ভয় লেগেছিল তার। এখন তেমনটি আর নেই। মাচালের দিকে এগিয়ে এল পশ্চিমে দিনমণিকে বিদায়



দিতে । আবছা চাঁদ তাকে সল্ল জোছনা দিচ্ছে । চাঁদের আলো সাজুর ছায়া
ফেলেছে তুরাগ নদীতে । মুঞ্চ হয়ে তা দেখছে সাজু, এতেই সাজু তৃপ্ত । আমার
জিজ্ঞেস করলো -‘দাদা, এতো দূর হতে কেন যান উদ্যানে । উদ্যান হতে
এটা তো অনেক সুন্দর পরিবেশ ! আমি তো মুঞ্চ হয়ে যাচ্ছি ।’
-হ্যা সুন্দর, কিন্তু মাএ একটি সুন্দর অন্য সুন্দরকে বুঝতে দেয় না যে, তাই অন্য
সুন্দরকে পাবার জন্যে চলে যাই ।’
তুচ্ছ হাসি দিয়ে বলল -‘উদ্যানে সুন্দরের কি দেখলেন আবার ? নষ্ট পরিবেশ,
সমস্ত উদ্যান জুড়ে বাদামের খোসা, আর সেখানে আপনি খুজতে যান সুন্দর্য, ভাল
বলেছেন !’
-‘পুরো ঢাকাতেই সুন্দর আছে, খুজতে হয় সাজু ।’

সাহিত্যিকদের মত কথাবার্তা বলে ফেললাম । অনেক সময় ভালই লাগে
সাহিত্যিক ভাবতে নিজেকে । বড় কঠিন কাজ এটা ! অনেক ঘ্যানো প্যাঁচাল
পাড়তে হয় । কোন গল্প তৈরিতে ব্যর্থ হলেই দেয়ালে কপাল টাকাও । এমনভাবে
কাজটা করতে হবে যেন রক্ত না বের হয় । রক্ত বের হলে ডাক্তারের জন্যে টাকার
টেনশন । কারন সাহিত্যিক মানি, পকেট ফাঁকা পাবলিক । সাজু যেভাবে সন্ধ্যা
আকাশ দেখছে তাতে কবি বলা যায় তাকে । সাজুকে বললাম -‘সাজু, আপনাকে
কবি কবি লাগছে । কবিতা জানেন নাকি কোন, জানলে বলে ফেলুন একটি ।’

-‘আমি আর কবিতা, হাসালেন । আমি কবিতা পছন্দ করি না, ফালতু কথাবার্তায়
ভর্তি থাকে । কবিগুরুর একটি লাইন জানি শুধু, সহজ কথা যায় না বলা সহজে ।
কবিতা জানলে ভাল-ই হতো দাদা, আজকে দুই-একটা কবিতা হলে মন্দ হতো
না । দাদা, আপনি পারেন না ?’

-‘পারি, কিন্তু সেগুলো আজকের পরিবেশের সাথে যাবে না । আজ দরকার চরম
কবিতা, তুরাগ নদী নিয়ে কবিতা । আমার নিজের একটি লেখা আছে, তবে চরম
কবিতা না, শুনবেন ?’

-‘বলে ফেলুন তো দাদা, আমি চরম নরম বুঝি না । কবিতা জানলে বলে ফেলুন ।’

কবিতা শুরু করে দিলাম -



এই নদীর সাথে হঠাৎ করেই দেখা,
দূরে এক ডুবুরির দল ।
হই হই করে উঠছে মানুষ, লষ্ঠনের আগুন,
ছুটছে নৌক, কাঁদছে শূন্য মা ।
তুরাগ কেন এত হিংস্র ? বুঝতে পারি না !
তুরাগের উওর দিকে রাখি চোখ,
জ্বলে সবুজ ধানের বাতি, রূপোর একটি থালা,
কোন এক বটগাছ আছে নুয়ে, যেন বুড়ো কোন শালা ।
বাপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে, খামছিয়ে ধরতে যদি পারি ।
গঙ্গির মার প্রাণ নেব করে, কেন এত মানুষ মারে ?
এই যান্ত্রিক শহরে তুরাগ নদীর খোঁজে,
আসবে কেউ বারেবার, জীবননন্দ সাজে ।

সাজুর কাছ থেকে হাত তালি পেলাম । না বুঝেই হয়তো তালি দিয়েছে ।
একজন কবির কাছে কবিতাটা দিলে, কেটেকুটে শূন্য দিয়ে দিত । অবশ্য সে-রকম
কবির কাছে দিলে শূন্য দিত, আজকাল কবিতা আর কবিতা নেই সখিবা হয়ে
গেছে । কবির মনে করেন, সমার্থক শব্দ দিলেই হয়ে গেল একটি কবিতা । কিন্তু
সমার্থক শব্দে কবিতা হয় না, সখিবা হয় । একজনের কবিতা পরেছিলাম । কবিতা
শেষ হয়, “কুত প্যাত মুত লুত ভ্যাত” দিয়ে । শত চেষ্টা করেও বের করতে
পারলাম না আসলে তিনি কি বুঝতে চেয়েছেন । শুধু একটি শব্দের অর্থ জানতে
পেরেছিলাম “মুত” অর্থ প্রসাব বা হিসু করা । ঐ লাইনটি দিয়ে তিনি হয়তো
বোঝাতে চেয়েছেন, পাঠকবৃন্দ আমার হিসু এসে গেছে, আজকের মত কবিতা
এখানে সমাপ্ত । এসব কবিদের নাম, মুত কবি । সাজু চুপ করে তুরাগ নদীর জল
দেখছে । চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে ফালতু কিছু কথা শোনাও ভাল । সাজুকে
বললাম - ‘আপনি তো সপুটা বললেন না ।’

- ‘সিট ভুলে গেছি, এখন বলছি শুনুন । খুব ভয়ঙ্কর সপু । আমি মাঝে মাঝেই
ভয়ঙ্কর সপু দেখি । কিন্তু, গত কছুদিন ধরে এক সপু বারেকরি দেখছি । মানি
ফিনিসিংটা এক রকম । দেখি, আমি কন্না করছি আর বলছি যেতে দাও আমার ।
লাল কাপড়ের আড়ালে একজন বলছে, আমায় চিনছেন ভাইজান । আমি হ



আমি। পাশ হতে এক লোক আমাকে গরম কিছু দিয়ে আঘাত করে। শব্দ করলে-
ই মেয়ে গলা আবার বলে, হ আমি, চিনছেন আমারে।’

গতকাল কি দেখলাম শুনুন, ‘মা আসলো সপ্নে। তার হাতে সাদা কাফনের
কাপড়। আমাকে বলল, এটা পড় বাবা আরাম লাগবে। তার পিছন হতে মেয়েটি
বলল, হ পড়েন আরাম লাগবো। আমারে চিনছেন ভাইজান। সাথে সাথে গরম
পানি পড়লো আমার গায়ে। শরীর খঁসে পড়তে লাগলো। আমি বললাম, আমাকে
যেতে দাও।’

-‘আপনি মেয়েটাকে দেখেন না?’
সাথে সাথে উত্তর -‘না।’

কথাটার মাঝে ভয় আছে সাজুর। ভয়টা খারাপ কিছু না কিন্তু মিথ্যেটা অনেক
খারাপ। মিথ্যা ভয়টাকে আরো বাড়িয়ে তুলে। সপ্নটার মাঝে আহামরি ভয়ের কিছু
নেই। নেশা আসক্ত মানুষ এর চেয়েও উদ্ভট সপ্ন দেখে। একদিন দেখলাম,
ফাঁসিতে ঝুলছি। জিভ বেরিয়ে আছে আমার। ঘাড়টা এক বিঘাত লব্ধা হয়ে
গেছে। মুখে রক্ত জমে নীল বর্ণ হয়েছে। একটা ক্ষুধার্ত কুকুর আমার পায়ের
আঙ্গুল অনেকটা খেয়ে ফেলেছে। হাড়ভিঁদ দেখা যাচ্ছে সেখানে। কেউ এসে
কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিল। সেই কেউটা আমিই ছিলাম! হা করে, এই আমি
ফাঁসির আমিকে দেখছি, আর খিল খিল করে হাসছি।

নৌকা পাড়ে পৌছে গেছে। নৌকার লষ্ঠনের আলো ব্যাতিত তেমন আলো
নেই। এই অন্ধকার পথ আমার পরিচিত আপনজন। এই অন্ধকারে চোখ হারিয়ে
গেলেও খুঁজে পাব আমার বিশ্বাস। নৌকাকে টাটা দিয়ে গৃহের দিকে যাচ্ছি।
সাজুর হাত ধরে আছি। লোকটা কোন কাজের না। শুধু নেশা গিলতে পারে।
বেশি দূর হাটা লাগলো না বাড়ির উঠনে আসতে। ষাট পাওয়ারের লাইটটি
সারাদিন-রাত ডিউটি দেয়। উঠনে তাই আলোর খাল। বাপসা আলোর বাড়িটিও
বাপসা। একেবারে ছন্দহীন বাড়ি। ছন্দহীন এই বাড়িতে সাজুর আনন্দ দিবে
উঠনের দুপাশে গাঁজা গাছ দুটো। তাকে বললাম -‘গাঁজা গাছ দেখেছেন কখনো?’
-‘না তো, কেন দাদা?’
-‘যা ভেবেছিলাম তাই, জানতাম দেখেন নি। আপনার দুপাশে দুটো গাছ আছে
চাইলে দেখতে পারেন।’



যত্নের সাথে দেখছে গাছ দুটো সে। সাজুর ভাগ্য আছে বটে। গাঁজা গাছ বছরে একবার হয়। এবারই প্রথম হলো আমার এখানে। গাছগুলো এত সজীব কেউ না দেখলে বুঝানো কঠিন। সাজুকে এখনো ম্যাজিক সাধুর নামটি বলা হয় নি। ম্যাজিক সাধুর কলকবজা উঠনে জড়ো করেছি। মৃদু আলোতে নেশার পাওয়ার বেশি। ভীমে যাওয়া যায় তাড়াতাড়ি। গভীর অন্ধকারে তাহলে কেমন হতে পারে? একবার দেখতে হবে ট্রাই করে!

দুজনে বসে পড়লাম উঠনের মাঝে। সমস্ত গ্রাম অন্ধকার। কেমন যেন বন বন লাগছে গ্রামটা। বনের মাঝে বারবিকিউ পার্টি করবো আমরা। মুরগির জায়গায় পোড়ানো হবে গাঁজা পাতা। সাজুকে বললাম -‘এর নাম ম্যাজিক সাধু। এটাই আমাদের আবিষ্কার!’

উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো -‘কি বলছেন, এর নামও আছে দাদা!’
-‘হ্যা, থাকবে না কেন। নাম ছাড়া কোন কিছুই পূর্ণতা হয় নাকি? মানুষ তার জীবন থেকে তার নামকে গুরুত্ব দেয় বেশি। যারা নামকে গুরুত্ব দেয় বেশি তারা তো আর নাম ছাড়া কিছু খাবে না, তাই জিনিসটার নাম রেখে দিলাম।’
-‘দারুন তো, একদম কাপাকাপি অবস্থা। একটু ধরে দেখি?’
-‘অজু করেছেন?’
-‘নাহ, করা হয়নি।’
-‘তাহলে, অজু করে আসুন। বাড়ির পিছনের দিকে চলে যান। কল পেয়ে যাবেন। অজুর পরে ধরে কেন চুমও দিয়ে দেখতে পারেন।’

সাজিয়ে নিয়েছি সব। সাজুর অজু হলেই বারবিকিউ পার্টি শুরু। ম্যাজিক সাধুর কাছে বসলে আমি কেমন যেন হয়ে যাই। এর উপর আমার অন্যরকম ভালবাসা। মানুষ মরবে কিন্তু তার ভালবাসাকে ভালবেসেই মরবে। আমার ভালবাসা কেবল ম্যাজিক সাধুর উপর। কেন যে তাকে ঘৃণা করতে পারি না। ঘৃণাটা দাও প্রভু আমার মাঝে। আমি আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই তোমার ধারায়। হে পৃথিবী, তোমার মাঝে আমি থাকতে চাই। আমায় তাড়িয়ে দিও না তুমি!

সাধুকে পোড়ানোর কাজ শুরু করে দিয়েছি। প্রথম টাঙ্গানোর উৎসাহে উঠেছে। ভিতরের সবাই আমাকে সাবধান হওয়ার সংকেত দিল। সাবধান না



হলেই অক্লা ! কিন্তু সাবধান হবো কেন ? সাধুর কাছে আবার কিসের সাবধানতা ? সে তো আমার ভালবাসা । সাজু প্রথম বার পিছনে পড়ে গেল । ব্যাস্ততা ম্যাজিক সাধু পছন্দ করে না । যে তাকে আরাম করে গ্রহন করবে তাকেই সাধু আরাম দিবে । আর অন্য সবাই পাবে বাঁশ ।

প্রথমবার মুখ দিয়ে টানলাম তাকে । সাজুকে বলে দিয়েছি ,প্রথমে মুখ দিয়ে গ্রহন করে পরে নাক দিয়ে গ্রহন করবো । সেই মতেই কাজ চালাচ্ছি । এখন খুব ভালই লাগছে । নেশার ভাষায় ,ভেরি পিনিক । একটি প্রবাত আছে ,একটানে যেমন তেমন দুইটানে মজা ,তিনটানে উজির-নাজির চারটানে রাজা । আমরা এখন রাজার পর্যায়ে মানুষ । বাইজি থাকলে ভাল হতো । নেশার মজা গান-বাজনায় আর কোমড় দোলানো নাচে । কিন্তু আমি তো নেশা করতে আসি নি ,এসেছি একজনকে মুক্তি দিতে । তাই ,এমন সখ ভাল না !

আমাদের শেষ শর্ত নীরবতা পালনের কাজ শেষ । চোখ খুলেছি কিন্তু কিছু দেখতে পারছি না । সাজুর কী অবস্থা বুঝতে পারছি না । আমিই কি হ্যালুসিনেশনে পড়ে গেলাম ! তবে মহা বিপদ । প্রভু রক্ষা করো ! চোখ ডলেও কোন লাভ হচ্ছে না । সাজু কি কোন কথা বলছে না, না-কি আমি শুনতে পারছি না । “সাজু, সাজু আপনি কি আছেন এখানে । আপনি কোথায় । কথা বলছেন না কেন ! আমি তো কিছুই দেখতে পারছি না । মনে হয় আমি হ্যালুসিনেশনের জগতে চলে এসেছি ।” তাহলে সাজুর কি হবে ?

লেখা-৪

রহস্য ভেদ করা বড় কঠিন কাজ । আমার থেরাপিতে আমিই কুপকাত হয়ে আছি । ওঝাকে ধরেছে সাঁপে বিষ নামাবে কোন জনা ? চোখ ধুতে পারলে ভাল হত । কিন্তু শত চেষ্টা বৃথা গেল । নিজ স্থান হতে উঠতে পারছি না । যতবার উঠতে চাচ্ছি ততবার মাথায় ব্যাথা পাচ্ছি । বুঝতে পারলাম না ,মাথায় কেন ব্যাথা পাচ্ছি ? মনে হয়, উঠতে গিয়ে বারবার সাজুর মাথার সাথে ধাক্কা খাচ্ছি । না, এমন তো হতে পারে না, সাজু আমার থেকে কমে তিন হাত দূরে বসে , তাহলে কেন যে ব্যাথা পাচ্ছি, বুঝলাম না । কড়া নেশায় মাঝে মাঝে এমন হয়, উঠতে কিছু একটা হতেই থাকে কিন্তু কেন হচ্ছে তার রহস্য রহস্যের মাঝে থেকে যায় ।



মাসুদের একবার এমন হয়েছিল। সবাই নেশা করে বসে আছি হঠাৎ সে প্যান্ট খুলে ফেললো, আবার প্যান্ট পরলো, আবার খুললো আবার পরলো। একটা পর্যায় সে তার প্যান্ট খুলে আর পরে। প্যান্ট খোলার সময় বলে, এই তো আসতেছে। পরার সময় বলে, উপরে যা, আরে উপরে যা তাড়াতাড়ি। নেশা কেটে যাবার পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কেন এমন করলো? মাসুদ বলল, কি যেন তার মাথার উপর হতে হাটা শুরু করে। নিচে নামার সময় বলে, প্যান্ট খোল আর উপরে উঠার সময় বলে, ভালই তো, আটকায় দে। তার কথা শুনে হেসে উঠেছিলাম। মাসুদ রেগে বলেছিল, তোদেরও একদিন হবে। সেই দিনটাই হয়তো আজ। কড়া নেশার মাঝে পড়ে গিয়েছি আমি। তাহলে কি, ব্যর্থ হলাম সাজুকে বাঁচাতে?

না, হই নি! সাজুর কথা শুনে পারছি এখন। তার কথা জড়িয়ে বের হচ্ছে। কেঁচোর হাটার মত মনে হচ্ছে কথাগুলো। একেবারে জিভের সাথে ঘেষে আসছে। সাজুর চোখ বন্ধ হয়তো, তাকে আমি একদমই দেখতে পারছি না। সে নড়াচড়া করছে বলে মনে হচ্ছে না। বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে - ‘খুব কঠিন জগত। কেন খেলছে জগত তার গর্ভের মানুষগুলো নিয়ে! আমি পিঁচাশ ছিলাম, ভালও তো হতে চেয়েছিলাম। তবে কেন পৃথিবী পিঁচাশের মত সব কেড়ে নিল। আমি মুক্তি চাই!’

কি বলছে সাজু, বুঝতে পারছি না। ও কি আমার কথা শুনবে? দেখি জিজ্ঞেস করে - ‘সাজু, আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?’

সাজুর কথা শুরু হল - ‘আমি বিওশালী পরিবারের সন্তান। ছোট বেলা হতেই আলাদা ভাবে বড় হয়েছি। বিলাশিতা, একরোখামিতা, অহংকার ছড়িয়ে ছিল আমার মাঝে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ মানুষকে, মানবতাহীন মানুষ বলে। আমি তাদের দলের একজন। নিম্ন শ্রেণীর কাউকে দুচোখে দেখতে পারতাম না। কথার আগেই হাত চালাতাম তাদের উপর। অকথ্য ভাষায় কথা বলতাম। সকলের কাছে আমি, ভয়ংকর সাজু স্যার। নিম্ন শ্রেণীর কারো হাতে কিছু খেতে অভক্তি হতো। আমার বাসার মধ্যে এদের আসা নিষেধ ছিল। কিন্তু শায়লার জন্যে কাজের মেয়েটাকে তাড়ানো খুব কঠিন হয়ে পড়লো।

আমার রুমে আসা মেয়েটির সম্পূর্ণ নিষেধ। তবুও তা নিয়ে ছুঁকলো সেদিন। সে আসতো না, যদি শায়লাকে গত রাতে চর না দিতাম। মেয়েটি চায়ের



কাপ রেখে বলল -‘ভাইজান, ভাবি উঠবার কইছে। আপনার চা রাইখা গ্যালাম, ঠান্ডা হইয়া যাইবো খাইয়া লন !’

কাপ ভেঙ্গে সকালের শুরু হল। কড়া কণ্ঠে বললাম -‘রাস্কেল, কতবার বলেছি রুমে আসবি না। শুয়ুরের জাত সব। কানে তুলো ভরে রাখিস নাকি ? ফ্যাল ফ্যালিয়ে তাকিয়ে আছিস কেন। বের হ শুয়ুরের বাচ্চা।’

কান্না করতে করতে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। তাদের কান্নার আবার কোন দাম আছে না কি ! সবগুলো নেমখারাম। সকাল বেলা মুড অফ করে ডাইনিং এ আসলাম। শায়লা বসে আছে। তার পাশে মোটা দুটো স্যুটকেস। মানি, সে চলে যাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল -‘মার বাসায় চলে যাচ্ছি। আমার সাথে আর কখনো যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবে না।’ চলে যাবে যাক। আমি মানুষকে কদুর তেল দিতে নারাজ। বললাম -‘যাও, কে বারন করেছে তোমাকে ? তোমাকে আনতে যাব না, ভাল থাকো।’

-‘তা-ই যাচ্ছি।’ আর বসলো না শায়লা। কেন বসবে, একার ভালবাস আর কতদিন। আমি তাকে ভালবাসি না। মিথিলার জন্যেই এমনটি হয়েছে। মিথিলার সাথে পরিচয়ের পর শায়লাকে দেখলেই গা পুড়ে যায়। গত রাতে শায়লার সাথে খুব খারাপ আচরন করেছি। এতটা করাও উচিত হয় নি। সে যাই হোক, আমারই তো বউ !

গাড়ি চালাতে চালাতে ইচ্ছে হল, মিথিলার সাথে দেখা করতে। অফিস আজ করবো না। মিথিলা সহ সবাইকে নিয়ে বাসায় আড্ডা দেব। একটু গান-বাজনা আর বিয়ার-টিয়ার হলে মন্দ হয় না। ধানমন্ডি লেকে চলে আসলাম। এখানেই বেশি সময় আড্ডা দেই আমরা। রাহুল আর অর্ক আছে। মিথিলা এখনো আসে নি। আমাকে দেখে রাহুল বলল -‘আসুন, ভাল আছেন শালা। ভাবি চলে গেছে না ! ভাল হয়েছে, খাটাস মানুষের সাথে না থাকাই ভাল। আর মিথিলার বার্থডে তো কাল, মনে আছে না গিলে ফেলেছেন ? আপনার বাসায় পার্টি দেই, চলুন ! ভাবি নাই, একটু মজা টজা করি।’

ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা। রাহুলের দিকে তাকিয়ে বললাম -‘রাহুল, তোমাকে ধন্যবাদ। আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে তোমাকে



মাফ করে দিলাম। খাটাস গালিটার জন্যে দুটা চর দেব ভেবেছিলাম তোকে। যা-ই হোক, কি করা যায় বল তো?’

পাশ হতে অর্ক গলা দিল -‘অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয় না, চল দূরে কোথায় চলে যাই। তুই বলবি এই ট্রুর মিথিলার বার্থ-ডে গিফট। আর আমরাও ফ্রি হাওয়া খেয়ে আসলাম।’

-‘মন্দ বলিস নি অর্ক, কিন্তু!’

-‘কিন্তু কিসের আবার, ভাবি তো বাসায় নাই। এখনই তো সুযোগ বন্ধু। তুমি এখন মুক্ত পাখি! মানুষ বিয়ের পরে গান গায়, এ খাঁচা ভাঙবো আমি কেমন করে আর তুই গা, মুক্ত পাখি উড়াল দিল অচিনপুরে। মুক্ত পাখিরা কি করে জানিস তো, সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পরে।’

রাহুল বলদা হাসি দিয়ে বলল -‘মুক্ত পাখি আর সাজু, তাহলে-ই হলো। সামনে তাকিয়ে দেখ, ঐ যে চলে এসেছে আরেক খাঁচা।’

মিথিলা আসছে। কি অদ্ভুত তার দেহ! সমস্ত দেহে এক মায়ার সাগর। তার গায়ের গন্ধটাও অতি সুন্দর। আধুনিক মেয়ে কিন্তু কেমন যেন এক স্নিগ্ধতা। চুল হাটলেই আপনা-আপনি লাফাতে থাকে। চোখে কাজল দেয়, নদীর আঁকাবাঁকা ঘাস আচ্ছন্ন পথের মত। যার মাঝে এক টলটলে সমুদ্রচোখ। এসব মেয়েদের নীল শাড়িতে দেবির মত লাগে। মিথিলা নীল শাড়িই পড়ে এসেছে। এজন্যে-ই মিথিলাকে ভাল লাগে। আমি মিথিলাকে যতটুকু ভালবাসি তার চেয়ে রাহুল অনেক বেশি বাসে। টাকা ভালবাসার মূল হাতিয়ার। আমার আছে, তাই মিথিলা আমার। বিবাহিত অবস্থায় প্রেমে অন্যরকম মজা। মনে হয়, শুকনো গাছে আবার পাতা গজাচ্ছে। মিথিলা কাছে এসে জড়িয়ে ধরলো আমায়। পিছু থেকে রাহুল বলল -‘মহারাজ তো দারুন খবর এনেছেন, মিথিলা। তোমার জন্যে না-কি সারপ্রাইজ!’

লাফ দেবার মত অবস্থা করে মিথিলা জিজ্ঞেস করলো -‘কি সেটা, রাহুল বলো না। এই সাজু, জান বলো না, বলো না, প্লিজ!’

উত্তর দিলাম -‘বলবো তো বেবি, তোমার জন্যেই তো সব।’

-‘তবে বলো?’

-‘টু-মোরো, উই আর গোয়িং টু ট্রুর। সেটা একমাত্র তোমার বার্থ-ডে উপহার।’

-‘ওয়াও, গ্লেট আইডিয়া। লাভ ইউ, সাজু। উম্মা.....হ।’

-‘লাভ ইউ টু, বেবি।’



আনন্দিত হলো মিথিলা। এমন আনন্দ সে সব সময়ই হয়। প্রতিবার বলে, তুমি খুব সুইট সাজু, আমার বাবুটা এত সুইট কেন? মেয়েদের কিছু দিতে পারলে ছেলেরা সুইট, এটা আমি জানি। তবুও মিথিলার বলাটা, খুব ভালই লাগে। কথাটায় কেন যেন মনে হয় জীবন আছে। মিথিলার কথা আমার কাছে যেমন জীবন্ত মনে হয়, তেমন করেই রাহুলের পিও বান বান করে বাজে। কেন যেন মনে হয় রাহুল আমাকে কিছু কথা বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না। হয়তো পারবেও না, সব কথা তো আর বলা যায় না। কবিগুরু তো বলেই গেছেন, সহজ কথা যায় না বলা সহজে।

চলে এসেছি আড্ডা থেকে। অর্ক আড্ডার মাঝে একটা সুযোগ লুটে নিয়েছে। সে বলে উঠলো - 'ট্রুয়ের খরচ কিন্তু সব সাজু বহন করছে।' আমিও লজ্জা এড়াতে বলে দিলাম - 'হ্যা, কেন নয়। তাছাড়া প্রতিবার আমিই দেই।'

হাসি আর অনেক কথার মাঝে ভুলে গিয়েছি আমরা কোথায় যাবো। স্থানই ঠিক করা হয় নি। গাজীপুর গেলে কেমন হয়। নুহাশ পল্লীটা শুনেছি অনেক সুন্দর। নাহ, রাহুলকে ফোন করি। তাকে বলি, প্লেজ ঠিক করতে। আমার প্লেজ ওদের ভাল নাও লাগতে পারে। রাহুলকে ফোন করতে গিয়েও থেমে গেলাম। কেন ফোন করবো, রাহুলটা কে? আমার টাকা আমার সব, আমি যেখানে বলবো সেখানেই যেতে হবে ওদের। যার ভাল না লাগবে যাবে না! রাহুল মিথিলার বন্ধু না হলে, কবে তার সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেত। কেমন ক্ষ্যাত ক্ষ্যাত লাগে রাহুলকে। বাজে চিন্তা থাক। আমরা গাজীপুর-ই যাবো।

বাসায় এসে কেমন যেন খালি খালি লাগছে। আজ শায়লা দরজা খুললো না। জিজ্ঞেস করার কেউ নেই, রাতে কি খাবে? দুপুরে কেন বাসায় আসো নি? এসব কথা আমার অসহ্য লাগে। রুমে গিয়ে কাজের মেয়েটাকে ডাকলাম - 'মাওয়া, এদিকে আসিস তো একবার।'

ডাকার সাথে সাথে দরজার বাইরে দাড়িয়েছে মাওয়া। আমি তাকে কখনো ডাকি নি। ব্যস্ত হয়ে বলল - 'জি ভাইজান, কিছু লাগবো?'

মেয়েটির চোখে ঘুম। ঘুম থাকারই কথা, অনেক সকালে উঠে মেয়েটি। দশ-বারো হবে বয়স তার, কৃষ্ণবর্ণের গা। দাঁতগুলো খিচুরী আর ডালের হালকা ভরা। চুল কোকরানো। একেবারে নীরহের ছাপ তার শরীরে।



কাজের মেয়ে। শায়লা তাকে অনেক যত্ন করেছে। কিন্তু তার রূপের কোন পরিবর্তন আসে নি। গ্রেট কালি সে। মা যখন বেঁচে ছিলেন, মাওয়াকে এ বাসায় আনা হয়েছিল। মায়ের সাথে খুব খারাপ আচরন করেছি তাকে তাড়ানোর জন্যে, কিন্তু পারি নি। মা মারা যাবার পর শায়লার জন্যে তাড়াতে পাড়লাম না। এখন সুযোগ, কিন্তু তাড়াতে পারবো না। ও চলে গেলে বাসার কাজ করবে কে? মাওয়ার বাবা-মা কখনো আসে নি তাকে দেখতে, হয়তো অত্যাধিক সন্তানের জন্যে মাওয়ার প্রতি ভালবাসা কম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম -‘শায়লা কিছু বলেছে?’

-‘হ, কইছে ভাইজান!’

-‘কি বলেছে?’

-‘বেশি রাইত বায়রা থাকবার মানা।’

-‘আর কিছু?’

একটু নিচু গলায় বলল -‘একটা মাইয়ার নাম কইছিল। হ্যারে নিয়া থাকবার কইছে!’

শায়লা চলে গেছে মিথিলার জন্যে। সে গতরাতে মিথিলার কথা জেনেছে। মিথিলার আল্লাদি ম্যাসেজ পড়েছে শায়লা। নিজের বরকে অন্য কেউ জান, জানু, কলিজা, বেবি বললে সব মেয়েদের শায়লার মত অবস্থা হবে। ব্যাস, অসুস্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলো বাসায়। অসুস্ত পরিবেশে আমি সুস্ত থাকতে পারলাম না। দিলাম চর বসিয়ে! কিন্তু মাওয়ার কাছে এসব কথা বলে ঠিক করে নি সে। এখন মনে হচ্ছে চর দেওয়াটা ঠিক হয়েছে। মাওয়াকে রেগে বললাম -‘রুমগুলো সাজিয়ে রাখিস। কাল আমার কিছু বন্ধু আসবে বাসায়।’

-‘ঠিক আছে ভাইজান!’

-‘শায়লা ফোন করে কিছু জিজ্ঞেস করলে, বলবি কেউ আসে নি, ঠিক আছে?’

-‘মিত্যা কমু ভাইজান!’ মেয়েটি শায়লার মত করে বড় হচ্ছে। মিথ্যা বলতে পারে না। চোখ রাঙ্গিয়ে ক্ষ্যাপা কঠে বললাম -‘চর দিয়ে দাত ফেলে দিব। মিথ্যা-সত্যি বলে কিছু নেই। মনিব যা করতে বলে তা-ই করবি। মনিব মানি বুঝিস, তুই যার কাজ করিস সে তোর মনিব। তোর মনিব তাহলে কে?’

-‘জি ভাইজান আপনে।’

-‘তাহলে যা বলেছি তাই করবি। এখন যা এখান থেকে।’



একা ঘুমাতে ভয় লাগে। আমার এক বন্ধু আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল। নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে পরপারে গমন, অস্তির এক অবস্থা। আগুন ধরাবার পরে বাঁচার জন্যে চেষ্টাও করেছিল। কোন উপায় নেই, একবার আজরাইল ভাইকে ডাকলে! আত্মহত্যার কারন-তার প্রেমিকার উড়াল, তাও আবার আমার কাছে। টাকা যার মুল্লুক তার। মেয়েরা টাকাকে ভালোবাসে। কেন ভালোবাসে? হয়তো, মেয়েদের দেহের শক্তি কম বলে টাকার শক্তি খোজে। বন্ধুর পুড়ে যাওয়া দেহ দেখে আমি অচেতন। সেই থেকেই কিছুটা ভয়ের জন্ম নিয়েছে।

বাসায় চলে এসেছে সবাই। মিথিলা চা বানানোর কাজে ব্যাস্ত। সকালের চা মস্তিস্কের মাঝে আপন মনে আরাম দেয়, আরামটা আজ পাই নি। শায়লার অভাব হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি তখন। কিন্তু অভাব পূরণ হয়ে যায়, মানুষ অভাব ভালোবাসে না বলে হয়তো। কথা হচ্ছে অর্কের বিষয় নিয়ে। একটা পাংকু মেয়ে পটিয়েছে সে। পাংকু হলেও, কোমল হৃদয় তার। মেয়েটির ওল্ড প্রেমিক ছাাকা মেরেছে, সেই সুযোগে অর্ক ভাগ পেল। মেয়েটি ডিক্কোতে যায়, নেশাও করে। ধনী বাবার একমাএ মেয়ে।

রাহুল বলল -‘মেয়ের বাবার কি প্লেইন আছে অর্ক?’

অর্ক -‘না তো, প্লেইন দিয়ে কি হবে? আর প্লেইন থাকলে কি, না থাকলে-ই বা কি, মেয়ে আছে তাতে আমার হবে।’

রাহুল -‘প্লেইন থাকলে ভাল হতো, তুই তো কিছুদিন পর কালো ভ্রমরা হয়ে যাবি। তোকে খুজতে হবে আকাশে বাতাসে। প্লেইন হলে কাজটা সুবিধা হতো! তাছাড়া, তোকে খুজতে তো আমাদের-ই যাওয়া লাগবে, প্লেইন থাকলে তোর কৃতজ্ঞতায় আমার প্লেইন ভ্রমন কাজটা সেরে নিতাম। বুঝিস-ই তো, গরিব মানুষের ছোট ইচ্ছে।’

অর্ক -‘এটা তোর ছোট ইচ্ছে হলে, বড় ইচ্ছে কোনটা রে রাহুল?’

রাহুল -‘বড় ইচ্ছে আছে একটা, বলতাম না তোদের। যেহেতু জোর করছিলাম বলে ফেলি, কি বলিস? সেদিন পেঁপারে পড়লাম চাঁদে যাওয়া যাবে নাকি ভ্রমনের জন্যে, তাও আবার তোদের ভাবিকে নিয়ে যেতে হবে। চার ঘন্টা আমি আর তোদের ভাবি চাঁদে বসে চোখে চোখ রেখে গল্প করবো, ব্যাপারটা চিন্তা করতে-ই ভাল লাগে।’



অর্ক - ‘ভাবি পেলি কোথায়, বিয়ে করে ফেলেছিস না-কি তুই। আমাদের না জানিয়ে কাজটা করে ফেললি শালা ? আর গল্প করতে চাঁদে যাবি ভাল কথা, বাসর করতে কোথায় যাবি, সূর্যে ?’

রাহুল - ‘হায় হায়, বিয়ে করি নাই তো, বিয়ের পরের কথা বলছি। বিয়ে করলে আমার বউ তোদের ভাবি না ? বাসর করতে সূর্যে গেলে বাসর আর হবে না, আমার আর তোর ভাবির ছাঁই দিয়ে দাঁত মাজতে পারবি। তোর তো শালা রাজ কপাল, দু’দিন পর পর লাট সাহেবদের বেটির সাথে ঝুলে পরিস। তোর ছাঁই লাগবে না, আমাদের ছাঁই দিয়ে দন্ত পরিস্কার করবে বস্তিবাসি। ঐ, তুই মেয়েদের সাথে চালবাজি করিস কেন এত ?’

অর্ক - ‘শোন, মেয়েরা হলো দুই মনের মানুষ। দুই মন এক সাথে আমি পটাটে পারি না, তাই মেয়েরা আমার সাথে চালবাজি করে, আমি করি না। আমি যেটা করি সেটা হলো, আমি মনে করি মেয়েরা হাতে রাখা একটা বিস্কিট। বিস্কিটের অর্ধেক অংশ আমি খাই, বাকিটা খেতে যাবার সময় হাত থেকে পরে যায়। এখন পরে যাওয়া খাবার কেন আমি তুলে খাবো ? তাই সেটা রেখে চলে আসি, অন্য ক্ষুধার্ত মানুষের আশায়, জানি এতে আমার আমল নামায় কিছু আমল লেখা হচ্ছে।’

অর্কের কথা শুনে না হেসে পারলাম না আমরা। আমি বললাম - ‘হ্যা, খুব আমলের কাজ করে ফেলসিস তুই। আমল গুলো কোথা দিয়ে যাবে জানো, তোমার পিছন দিয়ে। তুই যে নতুন বিস্কিট হাতে নিয়েছিস, বিস্কিটার নাম কি ?’

অর্ক - ‘বিস্কিটা ব্রান্ডের তো, নামটা ভাল-ই, জোলি খান। ছোট করে তোদের জন্যে, জে.কে।’

আমি - ‘জে.কের মেয়াদ আছে কতদিন, মেয়ের বাবা মেয়েকে কেমন ভালবাসে ?’

অর্ক - ‘মেয়াদ প্রায় শেষ, বিস্কিটে স্বাদ নেই। মেয়ের বয়স্ফেণ্ড কেতলা খতম করে দিয়ে গেছে। তবুও চেষ্টায় আছি স্বাদ পাবার, স্বাদ পেলে ফেলে দিব। মেয়ের বাবা মেয়েকে খুব ভালবাসে, আগের প্রেমিক মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে বলে গুন্ডা দিয়ে ঠাপ দিয়েছে। আমাকে জে.কে তার বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিল, পরিচয় পর্ব শেষ হতে না হতে-ই বলে, মেয়েকে আমি খুব ভালবাসি। তার কান্না আমি দেখতে পারি না, তাই আগেরটার হাত-পা গুরো করে দিয়েছি।’



তোমারটা করতে হবে না। যা লাগবে পেয়ে যাবে, কিন্তু আমার খুকি যেন কান্না না করে।’

আমি - ‘তোমার তাহলে খবর আছে এবার। মেয়ের বাবা তো কড়া পাপি, এই পাপির হাত থেকে রক্ষা পাবি না। পালানো ছাড়া উপায় নেই তোমার অর্ক।’

অর্ক - ‘উপায় রেখে অর্ক কাজ করে বন্ধু, এত সস্তা না। বিস্কিটাকে বলবো, আমার এইডস হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, সময় সীমিত, চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি, মরার আগে সংসার জীবনটা উপভোগ করে যাই। এই কথাগুলো বলবো আর কাঁদবো, সমাধান এখন তোরা ভেবে নে।’

আমি - ‘পারিসও শালা তুই, এই কথা বললে মেয়ের আগে তার বাপ পালাবে। একটা কাজ করিস, কথাগুলো বলার আগে মেয়ের বাবাকে মালের বোতল দিয়ে আসবি। মেয়ের সাথে বাবাও মাল খেয়ে কান্নাকাটি করলো।’

অর্ক - ‘কথাটা খারাপ না। ভাবছি মেয়ের মাকেও দুই বোতল দিব, সে-ও মেয়েকে খুব ভালবাসে।’

মিথিলা চা নিয়ে এসে পড়েছে। গা ঘেসাঘেসি এই মেয়েটার অভ্যেস। খারাপও লাগে না তার ঘেসাঘেসি। মাওয়া ডাইনিংয়ে খাবার সাজাচ্ছে। তার চোখ আমার আর মিথিলার দিকে। ছোট মানুষ হলেও, কোনটা ঠিক না তা সে জানে। মিথিলার সাথে এমন ঢলাঢলি তাকে খুব ব্যাথা দিচ্ছে। তার ব্যাথা, বিরক্ত, কান্না বা হাঁহাঁকারে আমার কিছু যায় আসে না। ছোট জাতের আবার কিসের আবেগ। রুমের বাইরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মাওয়া। জিজ্ঞেস করলাম - ‘বলবি কিছু?’

- ‘হু ভাইজান, খাওন দিছি টেবিলে।’

- ‘খাবার দিছিস, ভাল। খিদে লাগলে খাবে সবাই, তুই কেন এখানে আসলি?’

- ‘ইয়ে, ভাইজান, খাওন তো ঠান্ডা হইয়া যাইবো!’

রেগে উঠে বললাম - ‘ঠান্ডা হলে গরম করবি, তোকে রেখেছি কেন, এ.সির বাতাস খেতে? ভাগ এখান থেকে, গুয়োর!’

কাথাটা শুনে সে চলে গেল। সাথে সাথে অর্ক বলল - ‘সবাই খেয়ে নেই চল। কথা বলতে বলতে, ক্ষুধার দেবতা ভর করেছে পেটে। চোখের লজ্জায় এতক্ষণ বলা হয় নি!’

রাহুল ব্যঙ্গ করে বলল - ‘তোমার চোখে লজ্জা আছে অর্ক?’



-‘কেন থাকবে না, আমি অন্ধ না-কি?’

-‘না, তোকে তো কখনো কালো চশমা পড়তে দেখি নি।’

-‘কালো চশমা পড়লে কী হয়?’

রম্য করে বলল -‘তাহলে চোখ দেখা যায় না। যাদের চোখে লজ্জা আছে তারা কালো চশমা পড়ে।’

-‘হ্যা, বলেছে তোকে, ফালতু কথা রেখে চল খাই।’

শায়লা কখনো আমাকে খায়িয়ে দেয় নি। অন্যের হাতে খাওয়ার মাঝে তৃপ্তি নেই। অনেক খেলেও মনে হয় খিদে রয়ে গেছে। তবে খিদে থাকার মাঝেও ব্যাপক আনন্দ। মিথিলা সেই আনন্দটা আমাকে দিচ্ছে। তাই রাহুলের হৃদয় পোড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আর সাথে যোগ হয়েছে, মাওয়ার সমস্ত শরীর পোড়া গন্ধ। মাওয়ার পোড়া গন্ধ, আমাকে বার বার শায়লাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। শায়লার ভিতরের ভালবাসা বুঝাতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি মিথিলার আদরে সুখি। কেন যেন তার ভালবাসা মনে হচ্ছে অনেক বেশি তীব্র। মানুষ এজন্যে বোঁকা প্রানী, ভিতরের ভালবাসা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। বোঝার ক্ষমতা থাকলে, গাছের ভালবাসা সবাই বুঝতো। মানুষ খোঁজে উপরের মমতা, যা দেহকে খুশি রাখে। অর্ক বলল -‘কিরে মিথিলা, তুইও খা। তোদের দেখে তো আমাদের লজ্জা লাগছে, একদম খেতে পারছি না। এত খেলে, মহারাজ তো ফেটে যাবে।’

-‘হ্যা খাচ্ছি, ভ্যা ভ্যা করিস না তো, দেখছিস না বাবুটা খাচ্ছে। বাবুটার খাওয়া শেষ হোক আগে।’

-‘বাবু পেলি কোথায় তুই? কৈ, আমি তো দেখছি না?’

-‘তোর দেখে কি হবে, খাওয়া শেষ করে ফুটে পর, খাদক একটা। এই বাবু, তুমি খাও তো।’

অর্ক হাসছে, রাহুলের মাথা নিচু। সে হাত দিয়ে খাবারের সাথে খেলছে। মনে হয়, গোনা-গুনির খেলা। দিনে কয়টি ভাত খায় তা গুনে বের করতে ব্যস্ত সে। মাওয়ার মুখ সাঁপের মত ফণা ধরে আছে, সুযোগ পেলেই খপ! ছোট মানুষ আদরের পূজারি, যে তাকে আদর করবে তার পূজা করে ফলে। মাওয়া বুঝতে পারছে, এটা শায়লার প্রতি অবিচার ছাড়া আর কিছুই না। তাই মিথিলার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা তার মোটেও ভাল লাগছে না। কি করার আছে, মানুষ জল লাগার জিনিস খুব কম চোখে দেখে।



অর্ক আর রাহুল, এম.আর কে নিয়ে এসেছে। তাকে কেটে মিথিলার বার্থ-ডে পালন হবে। এম.আর কর্তন কাজটা আগে সারা উচিত ছিল। সবাই ভুলে গেছি আড্ডার দরুন। বাংলাদেশে এম.আর কর্তন কাজ অনেক বেড়ে গেছে। এই ব্যাকারির কেক খুব ভাল। সবাই মহা আনন্দে দৌড়াদৌড়ি করছি। যে যাকে ধরতে পারছে কেক লেপে দিচ্ছে গালে, অদ্ভুত খেলা একটা। ক্রিং ক্রিং ফোন বেঁজেই চলছে। ফোনের বাদ্য থেমে গেল। মাওয়া রিসিভ করেছে। শায়লা ফোন করেছে -‘হ্যালো, তোর ভাইজান কোথায় ? ঠিক মত খাওয়া দাওয়া করছে তো। যা যা লাগে করে দিবি। আর শোন..., হ্যালো মাওয়া, শুনতে পারছিস আমার কথা ?’

- মাওয়া নিম্ন গলায় বলল -‘হ ভাবি।’
- ‘কি হয়েছে মাওয়া, বল তো আমাকে। তুই ঠিক করে কথা বলছিস না কেন ? তোর ভাইয়া মেরেছে না-কি ?’
- ‘ইয়ে না ভাবি, কিছু হয় নাই তো। এমনই চুপ কইরা আছি।’
- ‘তোর ভাইয়া কোথায় ?’
- ‘বাড়িতেই আছে।’
- ‘বাড়িতে কেন, শরীর অসুস্থ করেছে নাকি, অফিসে যায় নি ?’
- ‘না, অসুস্থ করে নাই। অপিসেও যায় নাই।’
- ‘বাসায় এতো চিল্লাচ্ছে কারা ?’
- ‘ইয়ে ভাবি মানি !’
- ‘ইয়ে মানি টানি কি, কারা বাসায় ?’

মাওয়া নিরুপায়, এমন গোলকধাঁধা তার জন্যে নয়। এমন অবস্থায় কি বলতে হয় তা তার জানা নেই। সে শায়লার কাছে মিথ্যে বলতে পারবে না। প্রবল ভালবাসার কাছে মিথ্যার ঠাই নেই। এই ভালবাসার কাছে আমার শান্তির ভয়ও, মাওয়ার কাছে তুচ্ছ। মাওয়া সত্যি বলল। শায়লা ধঁপাস করে ফোন রেখে দিল। মাওয়া কিছুই বুঝতে পারছে না। কাজটা কি সে ঠিক করেছে ? যদি সে ঠিকই করতো তবে এত শান্ত কেন পরবেশ, যেমনটি সিডরের আঙুর হয়েছিল। কিছুক্ষণ শান্ত থেকে পরিবেশ, বাতাসের ধ্বননের শিকার হয়েছিল। মাওয়া বুঝতে পারছে আজ তার পিঠে তাল পড়বে। তাই চুপটি মেরে রান্না ঘরে বসে রইলো সে। শায়লা আমার মোবাইলে ফোন করেছে। রুমে সবাই বরফ হয়ে আছে। পিঁপড়ে



হাটার শব্দ নেই কোন। ফোন করেই আগুন ঝরা কণ্ঠে বলল -‘হ্যালো, সব বন্ধ কেন সাজু, লটর-পটর বন্ধ করে দিয়েছ কেন ? চালাও সাজু, বাংলা ছবির ডিপজলের মত ওড়না নিয়ে দৌড়াও। তোমার জন্যে ওটাই উরম।’

না বোঝার কণ্ঠে জবাব দিলাম -‘কী সব বাজে কথা বলছো শায়লা, কেন ফোন করেছ, বলো ?’

-‘হ্যা, এখন তো এগুলো বাজে কথাই। মেয়ে এনে বাসায় রঙ্গলিলা করো, আর আমি বললেই বাজে কথা। অনেক সহ্য করেছি সাজু, আই এম সরি নাউ। শোন সাজু, আর সম্ভব না তোমার সাথে। ডিভস লেটার পেয়ে যাবে, সাইন করে দিও।’

-‘হ্যালো, হ্যালো শায়লা শোন।’

-‘সরি সাজু, গুড লাক।’

শায়লার মুখে ডিভসের কথা শুনে আমার নাচবার কথা, কিন্তু কেন যেন চুপ করে বসে আছি। টগবগ করে রক্ত ফুটছে। আজব ব্যাপার, রক্ত ফোঁটার শব্দ তো পানির মত না, সম্পূর্ণ ভিন্ন। কানদ্বয় তবদো দিয়ে আসছে। মাওয়াকে উওম-মাধ্যম না দিলে সমস্ত রক্ত বাষ্প হয়ে যাবে। আমি উঠে দাড়ালাম। অর্ক জিজ্ঞেস করলো -‘কি হয়েছে সাজু, তোকে কেমন যেন উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কোন সমস্যা ?’

-‘কিছু না, তোরা একটু আড্ডা দে। আমি কিছুক্ষনের ভিতর আসছি।’

মিথিলা আলগা পিঁরীত দিয়ে বলল -‘কোথায় যাও বাবু, আমিও আসি ?’

-‘না, জাস্ট ওয়েট, ওকে ?’

মলিন কণ্ঠে -‘ওকে।’

রুমের দরজা লাগিয়ে মাওয়াকে হিংস্র কণ্ঠে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু তার কোন সাড়া নেই। দুটো রুম খুজে রান্না ঘরে তাকে পাওয়া গেল। বড়ই নিস্পাপ মুখে বসে রয়েছে মেয়েটি। আমায় দেখে কিছুটা কেঁপে উঠলো তার শরীর।

আনএক্সপার্ট অপরাধির মুখে খেলা করে ভয়, মাওয়ার মুখেও সেই ভয় খেলছে। চোখে রয়েছে ভাসমান অশ্রু। জিজ্ঞেস করলাম -‘এই ড্রাক্সেল, শায়লাকে কি বলেছিস তুই ? আমার কথা কানে যাচ্ছে না ? চুপ করে আছিস কেন, বল কি বলেছিস ? তোর জিভ টেনে ছিরবো আজ, শুয়োরের জাত।’



ভাসমান অশ্রু আর ভাসমান রইলো না, গড়িয়ে পড়তে লাগলো তাঁরা। মেয়েটি কোন কথাই বলছে না। বোবা জীবের পর্যায়ে চলে গিয়েছে সে। কুকুর, বিড়াল কিংবা ঘোড়ার সদৃশ্য। নাহ, ঠিক তাদের মতোও না। আঘাত করলে এরা সকলে ব্যাথা প্রকাশ করে, কিন্তু মাওয়া করছে না। যেভাবে পারছি মেয়েটাকে মারছি। হাত ব্যাথা করলে, পাঁ ব্যাবহার করছি, দুটোই ব্যাথা হয়ে গেলে কাছে যা পাচ্ছি তা দিয়েই আঘাত করছি। মোটামুটি রান্নার সব সরঞ্জাম গুলোই মাওয়াকে মারার সুযোগ পেল। ক্রান্ত হয়ে গেছি তবুও রাগটা কমছে না আমার। রাগ কমে একমাএ রক্ত বের হলেই। তাই করলাম আমি, দেয়ালের সাথে ধঁপাস। গলগলিয়ে রক্ত বের হতে থাকলো। শেষে ক্ষান্ত হলাম তার গায়ে গরম পানি ঢেলে। কেবল তখনই মাওয়া একবার বলল, ‘উহু’! হয়তো জ্ঞান হারালো সে। আমি এখন শান্ত, পারম শান্তি লাগছে মনে। কিন্তু তবুও যেন কার কথা ভাবছি, শায়লার কথা নয়তো? হ্যা, তার কথাই ভাবছি, কিন্তু কেন?

সবাই বেরিয়ে পড়লাম। বন্ধুরা কেউই আমার পিঁচাশ চরিএটা জানলো না। মাওয়ার এই একটি মাএ ভাল গুন, যতই আঘাত করি শব্দ করে না মেয়েটা। এই টাইপের মেয়েদের মারা খুব আনন্দের।

গাড়ি চলছে, গাজীপুর আমাদের ডাকছে। সবাই প্রথম দিকে খুব মজাই করছিল, কিন্তু আমার জন্যে থেমে গেছে ওরা। রোবট মানবের মত গাড়ি চালাচ্ছি। মিথিলার ন্যাকামি আর ভাল লাগলো না। তাই কয়েকবার তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছি। আজকের সন্ধ্যাটা বেশ সুন্দর। আমার তো কখনো সন্ধ্যা দেখতে ইচ্ছে হয় নি, সন্ধ্যা তো শায়লার ভাল লাগে। তাকে কতবার বলেছি, এসব সন্ধ্যা-ফন্ধ্যা দেখার ন্যাকামি ছাড়ো। আজ কেন আমার সন্ধ্যাকে ভাল লাগছে। আমি কী তাহলে শায়লাকে খুব মিস করছি? অনুভব জিনিসটা তাহলে কী এই রকম, আগে কেন বুঝি নি।

গাড়ি থামিয়ে দিলাম। সবার চোখে কৌতূহল। পিছন থেকে অর্ক বলল, ‘কী রে, গাড়ি থামালি কেন সাজু। তোর তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। সেই কখন হতে কেমন যেন করছিস। বল, এভাবে গাড়ি কেন থামালি?’

কিছুক্ষন চুপ থেকে বললাম - ‘ঢাকা যাবো, অনেক হয়েছে আর না। শায়লার কাছে যাবো। তাকে হাত ধরে বলবো, চলো, বাসায় চলো শায়লা।’



সকলে চুপ হয়ে গেল। মিথিলা কৃত্রিম দরদ দিয়ে বলল -‘এই জান, কী হয়েছে তোমার ? তুমি পাগলামি করছো কেন, শরীর খারাপ লাগছে, মাথা টিপে দেই বাবু।’

-‘চর দিয়ে দাত ফেলে দিব। জানের কপালে আমি ইয়ে করি। চুপ থাকো।’
আঙুর মুখ চুপসে কিছিমিছ হয়ে গেল মিথিলার। কিছিমিছ মুখ নিয়ে বসে রইলো সে, লজ্জা বলতে কিছু নাই মেয়েটার। গাড়ি থেকে নেমে যাওয়া উচিত ছিল তার। আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম -‘আমি ঢাকার দিকে ফিরবো এখন, তোরা কি আমার সাথে ফিরবি, না নেমে পরবি?’

নেমে পড়লো মিথিলা। গাড়ির দরজাটা তার সব শক্তি দিয়ে লাগালো। বলতে ইচ্ছে করছিলো আমার, ওই মাগি গাড়িটা কি তোর বাপের, বদমাশ।

আমি গাড়ি ঘুরিয়ে ঢাকার দিকে যাত্রা শুরু করলাম। রাহুল বলল -‘এই সাজু, পাগল হয়ে গেলি নাকি। মিথিলাকে রেখে কোথায় যাচ্ছিস?’

-‘শোন রাহুল, তোর নেমে যেতে ইচ্ছে হলে নেমে যা, ঘ্যানো প্যাচাল পারিস না তো, প্লিজ।’

-‘আচ্ছা, নামিয়ে দে আমাদের।’

-‘অর্ক, তুই ও নামবি?’

অর্ক নিরস কণ্ঠে বলল -‘হু, নামিয়ে দে!’

সবাইকে নামিয়ে দিয়ে সস্তির মাঝে এখন। যেন অধিক পরিশ্রম করে বেড়ে শুয়ে আমি। আমার এমন পরিবর্তনের কারন খুজছি। এটাই কী ভালোবাসা, অনেক প্রশ্ন নিজের মাঝে। একবার লুকিং গ্লাস এ সবাইকে দেখে নিলাম। হাত জাগিয়ে গাড়ি থামাবার চেষ্টা করছে তাঁরা। আমি সিওর তাঁরা পেরে যাবে গাড়ি থামাতে, তবে কিছুটা সময় লাগবে। মিথিলা যদি ইংরেজি মুন্ডির মত কাপড় উঠিয়ে দাঁড়ায়, তবে হয়তো সময়টা কম লাগবে। হে বন্ধুরা আমার, আমার নতুন জীবনের জন্যে দোয়া করো। আমি তেমাদের জন্যে দোয়া করছি, গাড়ি থামাতে সক্ষম হবো তোমরা।

লেখা-৫



শায়লার বাসায় বসে আছি। একমাএ শালিকা আমার সামনে বসে। তার সাথে আলাপ চলছে আমার। আলাপটা অত্যন্ত গভীর ধরনের - ‘মহিনী, তোমার পড়ালেখার কী খবর?’

- ‘ভাল ভাইয়া। তবে, পড়তে ভাল লাগে না আর। ভাইয়া, আপনি আমাকে একটা কাজ দিন তো, পড়ালেখা ঝামেলার উপকরন।’

- ‘তোমাকে তো একটা কাজ দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তাই ঠিক করে করতে পার নি।’

- ‘আমি তো আপুকে বলেছি, ভাইয়া এসেছে, তোমার রুমে পাঠিয়ে দেই? আপু বলল, নাহ। তার না-কি গাঁধা দেখতে এখন ভালো লাগে না।’

- ‘আবার যাও, তোমার আপুকে এবার বলবে, আপু শিল্পাঞ্জি এসেছে, তোমাকে দেখতে চায়।’

- ‘জি আচ্ছা ভাইয়া।’

এখন কোন কথাতে রাগ লাগছে না। শায়লার বলা কথাগুলো ভালই লাগলো। মহিনী যাবার আগেই শায়লা চলে এসেছে। বউটা আমার রোগা হয়ে গেছে, চোখের নিচে কালো দাগ করেছে। তিন রাত ঘুমায় নি বোঝা যাচ্ছে। মাএ যে কেঁদে আসলো তা-ও তাকে দেখে বুঝা যাচ্ছে। এত সুন্দর আমার বউ, আগে কেন দেখি নি? এখন দেখছি, বাংলা ভাষায় “প্রেমনয়ন” নিয়ে। শায়লা মহিনীকে তার রুমে যেতে বলে, আমাকে জিজ্ঞেস করলো - ‘কেন এসেছো, বিয়ের কার্ড দিতে?’

- ‘না, তোমাকে নিতে এসেছি।’

- ‘কেন?’

- ‘আমার বউকে নিয়ে যাবো, আবার কেন ফেন কী? আর, বাসায় একা থাকতে ভয় লাগে।’

- ‘ভয় লাগে কেন? তোমার মিথিলা আছে না, তাকে নিয়ে থাকো। আমি উঠি তোমার সাথে কথা বলার রুচি নেই আমার।’

- ‘কেন বউ, রুচি নেই কেন। জ্বর উঠেছে না-কি, আজই ডাক্তার দেখাব তোমাকে, চলো।’



-‘বাহ, দু’দিনে অনেক রসিক হয়ে গেছো, মনে হচ্ছে। ওহ, তুমি তো মিথিলার পরশ পেয়েছো। আর শোন, আমাকে বউ বউ করবে না। তোমার মিথিলাকে গিয়ে করো, যাও।’

-‘মেয়েটিকে তো একটা চাকরি দিয়ে এসেছি, সে এখন মহিলা ট্রাফিকের কাজ করছে। হা হা হা।’

-‘রাবিস কথা রাখো সাজু। বলো, কেন এসেছো?’

-‘তোমার ব্যাগ গুছিয়ে দিতে। অত জামা-কাপড়, তুমি কী একা গুছাতে পারবে।’

এবার খুব বিরক্ত হলো শায়লা। একেবারে একদমে নিজের রুমে গমন করলো। তার বিরক্ততা দেখে আনন্দ পেলাম। চা নিয়ে শায়লার মা এসেছে। আমার সালাম টালাম দিতে ভাল লাগে না। শায়লার মাকে মা বলতেও ভাল লাগে না। অন্যকে কেন মা বলবো, যতসব ফালতু নিয়ম। শায়লার মা তার অপমানটা আন্তরিকতার সহিত গ্রহন করেন। শাশুড়ি চা রেখে বললেন -‘সাজু বাবা, তুমি তো একদমই আসো না। তোমার খালু মাঝে মাঝে বলে তোমার কথা। বাবা, তোমার শরীরটা তো ভাল আছে, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছ।’

-‘হ্যা, শরীর ভাল খালা। আর দেখতে ইচ্ছে করলে চলে আসবেন বাসায়।’

-‘বাবা, আজ থেকে যে-ও, তোমার খালু এখনই চলে আসবে। আমি রান্না চরিয়ে দিচ্ছি।’

-‘না, থাকতে পারবো না। কাল কাজ আছে। শুধু শায়লাকে নিতে এসেছি।

খালা, আমি একটু শায়লার রুমে যাই, কিছু কথা আছে।’

-‘ঠিক আছে, তুমি শায়লার রুমে যাও, আর রাতে খেয়ে যে-ও বাবা।’

শায়লা আমার সাথে একটু বেশি খারাপ ব্যবহার করছে। মাথানত করার মানুষ আমি নই, তবুও তার কাছে করেছি। কিন্তু আর সহ্য করতে পারছি না। এটা কেমন কথা, আমি তো আমার ভুল মেনে নিয়েছি। আর হবে না তা-ও শায়লাকে বলেছি। তবুও কেন এত অপমান করছে আমাকে। এবার আমি ক্ষিপ্ত। অনেক হয়েছে তেল দেয়া, আর না। শায়লাকে জিজ্ঞেস করলাম

শেষবারের মত -‘তুমি কি তাহলে যাবে না। এটাই তোমার শেষ কথা, শায়লা?’

-‘হ্যা, এটাই আমার শেষ কথা। আর তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি, তুমি লেটার পার্টিয়ে দিব। আশা করি সাইন করে দিবে।’

-‘তাহলে তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো? ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।’



-‘আমি তোমাকে আসতেও বলি নি, চলে যেতেও বলি নি। তোমার খালার বাসায় তুমি এসেছো, নিজ ইচ্ছায় চলে যাবে।’

-‘খালার বাসা মানি ? আগে খালার বাসা ছিল, এখন তুমি আমার বউ। সো, এটা আমার শশুড় বাড়ি।’

-‘কিসের শশুড় বাড়ি, তুমি আমার মা-বাবাকে কখনো আপন করে দেখেছো, সাজু ? তুমি তাদের খালা-খালু বলে জানতে, এখনও তাই জানো। তাছাড়া তাদের আপন করে নেবারও কিছু নেই, তুমি তো আমাকেই আপন ভাবো নি কখনো।’

-‘শায়লা, তুমি কি যাবে, না-কি যাবে না ?’

-‘তুমি চাইলে আসতে পারো সাজু।’

আর বসে থাকার কোনো মানি হয় না। পথের কুকুরও খাবারের জন্যে এত তেল দেয় না মানুষকে। ঘন্টায় ১০০কিঃলো বেগে বেরিয়ে গেলাম বাসা হতে। শায়লার মা কয়েকবার আটকানো চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমার বেগ কমে নি। শায়লা সম্পর্কে আমার খালাতো বোন। মায়ের কারেন্ট জালে পড়ে তাকে বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের কিছুদিনের ভিতর মা-বাবা গাড়ি একসিডেন্ট করে পরপার, আর আমি যেতে লাগলাম ঘন ঘন নাইট ক্লাব। এত টাকা উড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব না, তাই বন্ধুদের নিয়ে দামি দামি নেশাগ্রস্ত হলাম। বাবার অফিসেও বসতে লাগলাম মাঝে মাঝে। মিথিলার মত মেয়েদের সাথে রাতও কাটাতাম মাঝে মাঝে, শায়লার জন্যে সময় কৈ। কিন্তু এখন তো আমি সময় নিয়েই এসেছিলাম শায়লা, কিন্তু তোমার সময় নেই। সময়ের এত রূপ কেন ?

রাগটা আবার মাওয়ার উপর উঠলো। বাসায় গিয়ে আরেকবার ধপাধপ দিব তাকে। ওর জন্যেই এত অপমান হতে হলো। বাসায় এসে মাওয়াকে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু মেয়েটার সাড়া নেই কেন ? হেটে রান্না ঘরের দিকে গেলাম। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে উঠতে দেরি করলো না। মাওয়া কোথায়, এখানে তো একটা কুষ্ঠ রোগী পড়ে আছে। সমস্ত শরীরে ঠোস পরেছে তার। রাগের মাথায় একি করেছি আমি। মেয়েটা কী মারা গেছে, না-কি অচেতন হয়ে আছে এখনো। কি করবো বুঝতে পারছি না। তাকে হাত দিয়ে ধরতেও যুগা লাগছে। তার অবস্থা দেখে বমি আসছে আমার। পানিটা যে এত গরম ছিল, তখন কেন বুঝলো না। পা দিয়ে তাকে ঠেলা দিলাম। একটুও শব্দ নেই তার। জ্বত পায়ে হেটে চাড়া



পানি নিয়ে আসলাম, সমস্ত শরীরে ঢেলা দিলাম তার। মেয়েটা নড়ছে না কেন ? হাত নিলাম নাকের কাছে তার, নাহ মারা যাই নি মাওয়া। এখনো দম নিচ্ছে সে। যাক বাঁচা গেল, এখনি তাকে হসপিটাল নিতে হবে। দু'হাত ধরে তাকে টেনে বের করলাম। তার হাত ধরতে-ই বমি চলে আসলো আমার। কিছুক্ষণ বমি করলাম আরাম করে। নাক বেঁধে মাওয়াকে হসপিটাল নেবের জন্যে বাসা থেকে বের হয়েও হলাম না। ডক্তার যদি জিজ্ঞেস করে কিভাবে হয়েছে, পুলিশের ঝামেলা যদি হয়। তাকে হসপিটাল নেয়া মানি মহাবিপদ। ঘামে শরীর ভিজে যাচ্ছে আমার। মেয়েটাকে হসপিটাল না নিলে মারা যাবে। শায়লাকে একটা ফোন করি। তাকে বলি, 'মাওয়া রান্না করতে গিয়ে গা পুড়িয়ে ফেলেছে। তুমি এসে তাকে হসপিটালয়ে নিয়ে যাও।' না না, এটা করা ঠিক হবে না। শায়লা বুঝে যাবে তাকে মারা হয়েছে। শায়লা কেন, মাওয়াকে দেখলে সবাই বুঝে যাবে, নির্যাতন করা হয়েছে। বিপদে আল্লাহর নাম এমনিতেই বলে সবাই, আমিও বললাম, হে মাবুত রক্ষা করো। কয়েক প্যাক হুইস্কি খেয়ে নিলাম, এতে ভয় অনেকটা কমে। আমি সিগারেট খাই না, তবুও পর পর অনেকগুলো সিগারেট খেলাম। হে মাবুত, বুদ্ধি দাও !

আচ্ছা, মাওয়াকে নদীতে ফেলে দিলে কেমন হয়। একটা কিছুতে ভরে তাকে ফেলে দেয়া হবে। বাসায় কি বস্তা আছে, বস্তায় ভরে ফেলে দেই। তাহলে সব সমস্যার ইতি। বস্তা পাওয়া গেল না, বড় টলি ছিল একটা, তাতেই তাকে ভরে ফেললাম। মেয়েটা তখনো বেঁচে ছিল। টলিতে তাকে ভরতে অনেক কষ্ট করতে হলো আমার। টলি তো ভেসে থাকে, মাওয়ার ভারে কি ডুববে, নাও ডুবতে পারে, তাই একটা ফুটো করে দিলাম টলিটা। দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে গাড়িতে ভরে নিলাম মাওয়াকে। এখন নদীর খোঁজ করছি। ঢাকাতে নদীর বড়ই অভাব। গ্রাম হলে ভাল হতো জীবিত মাওয়াকে গুম করতে।

বাসায় চলে এসেছি। মাওয়া এখন নিখোঁজ সংবাদ। কোন রকমে বাতী পাব করে দিলাম। সকাল হতেই মাথায় আসলো, কেউ মাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে কি বলবো, আবার এক বিপদ। শেষে ঠিক করলাম, মাওয়া বাসা হতে পালিয়েছে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই মাইকিং করতে হবে আর মিউজ পের্পারে একটি নিখোঁজ সংবাদ দিতে হবে। তাই করে দিলাম বাতী বাতী



সত্যি মনে হয় সবার। জামার রংটা মিথ্যে বলে দিলাম। মাওয়া ছিল লাল রংয়ের জামা পরে।

নিখোঁজ সংবাদ

২৭/০৫/২০১২ইং, আনুমানিক সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকার সময় মাওয়া নামের একটি মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে। মেয়েটির বয়স বারো, গায়ের রং কালো। উচ্চতা ৪ফুট। হারানোর সময় তার গায়ে ছিল হলুদ রংয়ের জামা। যদি কোন ব্যক্তি তার খোঁজ পেয়ে থাকেন, তবে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করা হইলো।

বাসা নং-৩৫৪/এ, মনিপুরী পাড়া,
ফার্মগেট, ঢাকা।

বিপ্লব -যাতায়াত খরচ দিয়ে দেয়া হবে।

লেখা-৬

অনেক দিন চলে গেল। অনেকের চলে যাওয়া দিনগুলো আনন্দময় থাকে, আমি সেই অনেকের ভিতর পড়লাম না। একা থাকার অর্থ ভয়ংকর অভিষাপ। এই অভিষাপের মাঝে আরেক অভিষাপ যুক্ত হলো আমার জীবনে, তার নাম নেশা। রাহুল, অর্ক অথবা মিথিলা কারো সাথেই যোগাযোগ নেই। আমার বউ শায়লাও এখন তাদের দলে। দলে দলে দলা দলি, আমি এখন নেশা করি। প্রতিরাতেই খুব ভয় লাগে। ঘুমের আগেও ভয় পাই, ঘুমের ভিতরেও পাই। ঘুমের ভিতরের একটি ভয় বলি -খুব ছোট একটি মানুষ, তাকে আমি চিনি। তার নাম জুনরেয় বালাউইং (সবচেয়ে ছোট মানুষ-৩৩১১)। তার মাথায় একটি মুকুট। মুকুটটি এক মিলিমিটারেরও কম। মুকুটটি বেঁধে পরেছে তিনি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ডাক্তার। আমাকে বলল -‘সাজু, কি অবস্থা তোমার। ঘুম না-কি ঠিক মত হচ্ছে না, ভয় পাও রাতে তাই তো?’



বড় সমস্যা না। আজ রাতে তোমার খুব ঘুম হবে। আগে বলো, তুমি কি আমাকে চিনেছ ?’

আমি বললাম -‘হ্যা, আমি আপনাকে চিনেছি। কিন্তু আপনি যে ডাক্তার তা আমি জানতাম না। আজ কি সত্যি আমার ঘুম হবে ?’

-‘আমি মিথ্যা বলি না। তুমি তো রানি এলিজাবেথকে দেখেছো। তিনিও জানেন, আমি মিথ্যা বলি না। এজন্যে-ই, তার জন্যে তৈরি এই মুকুটটি তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন। তার মুকুটটি-ই আমাকে দিত, কিন্তু তার মুকুটে আমার চোখ, মুখ সব ঢেকে যায়। তুমি কি জানো এটা কার তৈরি ?’

-‘না, আমি জানি না।’

-‘এটা উইলার্ড বানিয়েছেন, রানি এলিজাবেথকে উপহার দেবার জন্যে। রানির মুকুটে যা যা আছে, এটাতেও তাই আছে। এটা তোমার জানা দরকার ছিল, সাজু। এখন বলো, তোমার কেন ঘুম হয় না। শুনেছি তুমি খুব নেশা করো। ইদানিং নাকি মারিওজুয়ানা বাবা ধরেছ ?’

-‘নেশা না করলে খুব ভয় লাগে আমার। একা একা বাসায় থাকাটা খুবই ভয়ংকর। মারিওজুয়ানা কি দাদা ভাই ?’

-‘যা খাও তার নাম জানো না, ছি সাজু। মারিওজুয়ানা হচ্ছে গাঁজার উপমহাদেশিয় নাম। বলো, কেন গাঁজা খাও ?’

-‘ভাই নামটা না জানার জন্যে সরি। গাঁজা খেলে দুরন্ত ভাল লাগে, কারন ছাড়া হাসি। আয়নার সামনে দাড়িয়ে, নিজেকে প্রশ্ন করি, আর হাসি। কি প্রশ্ন করি শুনুন -বলি, সাজু তুমি তো দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছ, এখন কি প্যান্টে হিসু করে দিবে ? আয়নার মানুষটা উওর দেয়, হ্যা দেব, হ্যা দিব, হ্যা দেব। তার উওর দেবার মুখ দেখলে আমার হাসি আসে।’

-‘খুব ভাল, আমাকে একটু দাও তো, অনেক দিন ধরে হাসি না। নাম ডাক হয়ে গেলে এই এক সমস্যা, হাসতে চাইলেও হাসা উচিত না। ভরা সমাজে নিজের ভরটা কমে যায়, হাসলে। তুমি গাঁজা কিভাবে আনো ?’

-‘একজন ফোন ম্যান আছে, নাম কালু। সেই আমাকে দিয়ে স্বাস্থ্য পেন্টুলির সাথেও বেল্ট পরে সে।’

-‘মজা তো, তুমি কি তার প্যান্ট খুলে দেখেছো ? চমরা বেল্ট নাকি বেল্টের ?’

-‘তা জানি না, কিসের বেল্ট। তবে, বেল্ট পরে। একদিন আমার সামনে তার প্যান্ট খুলে গিয়েছিল, তখন দেখেছি।’



-‘পরপুরুষের সব জায়গায় তাঁকাতে নেই সাজু। ঠিক আছে, এখন তোমার ঘুমের ব্যবস্থা করা হবে। আমাকে একটু গাঁজা দাও, আগে একটু হাসি। তুমি চোখ বন্ধ করো সাজু। তোমার বাসায় কি হাত-পাঁ বাঁধবার জন্যে কিছু আছে। না থাকলেও সমস্যা নেই, আমার কাছে আছে।’

-‘হাত-পাঁ কেন বাঁধবেন জুনরেয় ভাই?’

-‘চুপ করে থাকো, রানি এলিজাবেথকেও বেঁধেছিলাম। তিনিও চুপ ছিলেন।’

জুনরেয় বালাউইং আমার হাত-পাঁ বেঁধে নিলেন। তার হাতে মাছ মারার বরশি। বড়ো এক হাতুড়ি বের করলেন ব্যাগ থেকে। আলপিন, ম্যাচ আর একটি আতশ বাজি বের করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম -‘এগুলো কেন বের করছেন। আপনি কি আমাকে খুন করতে চান? আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ঘুমতে চাই না।’

তিনি বললেন -‘তোমাকে যে ঘুমতে হবেই সাজু, জুনরেয় বালাউইং ঘুম না পরিয়ে যায় না। দেখি হাঁ করো তো।’

জোর করে সে আমাকে হাঁ করিয়ে বললেন -‘তোমার দস্ত খুবই ভাল, ম্যাজিক পাওডার ব্যবহার করো মনে হচ্ছে, প্লেস গানটা যেন কি, জোরছে বলো তাই না?’ আমি কথা বলতে পারছি না। মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, হ্যাঁ। বরশির গালা আমার জিভের ভিতর ফুরে টানাটানি শুরু করলেন জুনরেয়। আমি কোন কথা বলতে পারছি না। খুব যন্তনা করছে। হাতুড়ি দিয়ে আলপিন গেঁথে দিলেন সে। মুখে আতশ বাজি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বললেন -‘সাজু তোমার চোখ এখন সব সময় ঘুমবে, চিন্তার কোন কারন নেই ভাই। আমি তাহলে আজ আসি। এরপরে কোন সমস্যা হলে আবার আসবো। শুভ হোক তোমার ঘুমের জীবন, খোদা হাফেজ।’

আমি তাকে বলতে চাচ্ছি আমাকে ছেড়ে দিন, কিন্তু পারছি না। সে হাওয়া হয়ে গেল। বাজিটা ফুটবে ফুটবে ভাব, এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এমন ভয়ংকর সপ্ন আমাকে ঘিরে ধরেছে।

দরজায় শায়লা দাড়িয়ে। নেশা করে আছি বলে, তেমন অবাক হলাম না। তার সাথে কোন কথাও বললাম না। সে নিজে থেকেই ভিতরে ঢুকে এলো। জিজ্ঞেস করলো -‘ভাল আছো? অনেক রোগা লাগছে তোমাকে।’



-‘হুম।’

-‘কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, এতদিন পরে দেখা হলো, কেবল হুম বললে যে?’

-‘আর কী শুনতে চাও?’

-‘তুমি কি নেশা করেছ সাজু!’

-‘হ্যা, করেছি, প্রতিদিনই করি।’

-‘হুম, খুব ভাল করছো। এখন আমাকে বলো তো, মাওয়া কিভাবে নিঁখোজ হলো? আমি ওর বাড়িতেও গোপনে খোঁজ করেছি, সে তো তার বাড়িতেও যায় নি।’

-‘তুমি কি, এসব কথা জানার জন্যে এসেছো শায়লা?’

-‘নাহ, আমি কেন এসেছি তা আমি জানি না। কথা পাচ্ছি না, তাই তার প্রসঙ্গটা তুললাম। আচ্ছা, মাওয়া কি সত্যি নিঁখোজ হয়েছে, নাকি অন্য কিছু?’

-‘অন্য কিছু মানি, তুমি কি বলতে চাও আমি তাকে খুন করেছি।’

-‘তুমি রাগ করছো কেন, আমি তো বলি নি তুমি তাকে খুন করেছো। তোমাকে দিয়ে তো ঠিক নেই, সব কিছুই করতে পারো। তুমি তো একটা সাইকো।’

শরীরটা ঘামিয়ে যাচ্ছে কেন। শায়লার কথাগুলো ভাল লাগছে না। তার এই কথার কোন উত্তর দিলাম না। প্যাক বানাতে থাকলাম। শায়লা আবার প্রশ্ন করলো -‘তাহলে মেয়েটার কোন খোঁজ পেলে না?’

-‘নাহ, পাই নি। চেষ্টা তো কম করি নি, যতটুকু করার ছিল, করেছি।’

-‘ওহ! আর, এসব বাজে জিনিস কবে ধরলে। আগে মাঝে মধ্যে খেতে তা ঠিক ছিল, এখন! একি অবস্থা তোমার?’

-‘তুমি যেদিন আমাকে ছাড়লে, সেদিন থেকেই ধরেছি।’

-‘বাংলা ছবির সংলাপ রাখো, সাজু, শরীরটা তো একেবারে দিয়েছো নষ্ট করে। দেখি গ্লাসটা আমার হাতে দাও। এখন বলো, মিথিলাকে কবে বিয়ে করছো?’

-‘যোগাযোগ নেই ওর সাথে। আর বিয়ে কিভাবে করবো, তুমি তো ডিভস দিলে না।’

-‘হ্যা দেব, আগে বলো বাসায় খাবার কিছু আছে?’

-‘নাহ নেই, ক্ষুধা লাগলে চিপস খেতে পারো। আমি বেশি ভাগ সময় চিপস খাই।’

-‘ওহ, ভাল। এখন টাকা দাও, আজ বাসায় রান্না হবে। তুমি তো মাঝে মধ্যে পরে আছো, বাজারে আমাকেই যেতে হবে।’

-‘টেবিল থেকে নিয়ে নাও টাকা।’



শায়লা টাকা নিয়ে বাজারে চলে গেল। যাবার আগে নেশার দ্রব্যগুলো যন্ত্রের সহিত সাথে নিয়ে গেল, একটুও বাঁধা দিলাম না। মনে হলো, এমনটা করা তো তার অধিকার। ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে আজ।

বাহারী রকম রান্না হচ্ছে বাসায়। গন্ধগুলো ব্যাপন প্রকৃয়ায় ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে। পাশের বাসার বররা তাদের বউদের উপর মেজাজ দেখাচ্ছে। তারাও শায়লার মত রাধুনী চায়। মুখ গোমরা করে বসে আছে সবাই। ওদিকে কুকুরের মত গন্ধ নিচ্ছে ক্ষুধার্ত মানুষ। এই গন্ধ তাদের পেটকে শান্তি দিচ্ছে। কিন্তু কাউকে দেব না, সব রান্নাই কেবল আমার। বাচ্চা হয়ে গেছি আমি, আবার বাচ্চা হওয়াটাই হয়তো আনন্দের।

ডাইনিং রুম অনেক দিন পর খাবারে ভরে উঠেছে। আলু দিয়ে গুড়া মাছের চচ্চরিটা আমার প্রিয়, শায়লা সেটাও করেছে। তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছি। খাবার মাঝে শায়লা জিজ্ঞেস করছে -‘রান্না ভাল লাগছে তোমার, সাজু? অবস্য তুমি কখনো বলবে না জানি, আমার সব কিছুই তো তোমার খারাপ লাগে, তবুও জিজ্ঞেস করলাম।’

-‘হুম, ভাল হয়েছে।’

-‘একটা কথা জিজ্ঞেস করি?’

-‘করো!’

-‘রান্না ঘরের সব কিছু কেমন যেন মনে হলো। রান্না করার সরঞ্জাম গুলো ওমন চিমিয়ে গেল কিভাবে, বুঝলাম না? যেন মনে হচ্ছে, কেউ ওগুলো দিয়ে কাউকে মেরেছে, তুমি কি জানো কিছু?’

-‘না, আমি কীভাবে জানবো?’

-‘ওহ, আমি ভেবেছিলাম তুমি জানতে পারো। আচ্ছা সাজু, রান্না ঘরের দেয়ালে কেমন যেন রক্তের দাগ, দেখেছো তুমি?’

খাওয়া থেমে গেল। কী সব আজোবাজে আলাপ করছে শায়লা। ধুর, ভেবেছিলাম মজা করে খাবো আর হলো না সেটা। তার প্রশ্নগুলো আমাকে দারুন সংকটে ফেলছে। কপালে ঘামের তৈরি হচ্ছে। আমি মুখটাকে ঠিক রাখার চেষ্টা করলাম। একটু হেসে শায়লাকে বললাম -‘সে এক মজার কথা, আমি বলি’



যেন ভেবে একটি মুরগি কিনে আনলাম। ভেবেছিলাম তুমি বাসায় আছো। ভুলেই গিয়েছিলাম সেদিন, তুমি তো বাসায় নেই। বাসায় এসে মনে পরলো, শায়লা তো বাসায় নেই, রান্নাটা কে করবে। ওদিকে মাওয়া হারামিটাও পালিয়েছে। মুরগিটা খুব খেতে ইচ্ছে করছিলো, তাই নিজেই চেষ্টা করলাম রান্না করবার, তার রক্ত হয়তো। সেদিন কি আর রান্না হলো, রান্নার র-ও হলো না, হাত পুড়ে গেল একটু। দেখ, এইখানটা পুড়েছে।’

গাঁজা খেতে গিয়ে কিছুটা পুড়েছিল তাই দেখিয়ে দিলাম শায়লাকে। সে ভদ্র হাসি দিয়ে বলল -‘তুমি আর রান্না, ভালই বলেছ।’
-‘কেন, কখনো করি নি বলে কি করতে মানা। তাছাড়া, পারি আর না পারি চেষ্টা তো করেছি।’
-‘হ্যা, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।’

বাঁচা গেল, শায়লা আমার কথা সত্যি ভেবেছে। খাবার শেষ করে টেলিভিশন দেখতে বসেছি, ডিসকভারি চ্যানেল এটা। মানুষ বনাম বন্যপ্রাণী অনুষ্ঠানটা দেখছি। অনুষ্ঠানটিতে এডওয়ার্ড মাইকেল গ্রিলস লোকটি অদ্ভুত কর্মকাণ্ড করেন। লোকটিকে বেয়ার গ্রিলস নামে মোটামুটি অনেকে চেনে। খুব আনন্দের সাথে সে তার নিজের মুত্র খেয়ে থাকেন অনুষ্ঠানটিতে। মস্তিষ্ক বিকাশিত অনুষ্ঠানের ভিতর এটি আমার দিক থেকে প্রথম, কিন্তু শুনে দুঃখ্য লেগেছে মার্চ থেকে এর কার্জক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাই পুরনো পর্ব দেখছি। শায়লা হাতের কাজ সেরে আমার পিছনে হাত রাখলো। চমকে উঠলাম স্কানিকটা। শায়লা বলল -‘একি, ভয় পেলে নাকি?’

-‘হ্যা, ভয় তো পাবারই কথা। একা থাকার অভ্যেস হয়ে গেছে, তুমি যে ছিলে ভুলেই গেছি।’

-‘সাজু, তুমি চেঞ্জ হয়ে গেছ।’

-‘হবার-ই কথা, তুমিও তো হয়ে গেছ।’

-‘তাই বুঝি, কেমন চেঞ্জ হয়েছি আমি?’

-‘এই যে, কতদিন পরে দেখা হলো, একটু বুকেও এলো না।’



শায়লা নিশ্চুপে বুকের মধ্যে শুয়ে পড়লো। তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। এই পানির নাম, সুখপানি। আমার মাঝে কেমন যেন অনুভব জন্ম নিচ্ছে। এই অনুভবগুলো, কঁচি পাতা ছোবার, কনকনে শীতের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে হাঁটা অথবা গভীর অরন্যে ভীত হবার অনুভূতির মত। শায়লা বুকের মাঝে ঢুকে যেতে চায়। তার চোখ, তার মন, তার দেহ উচ্চ কণ্ঠে কাঁদতে চায়। শায়লার চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম আমি। বড়ই মায়া লাগছে আমার। এই মেয়েটা আমাকে এত ভালবাসে, কিভাবে এত ভালবাসা যায়। কলিংবেল বেজে উঠলো। শায়লা নিজেকে সামলিয়ে নিল। আমার মেজাজটা দারুন খারাপ হলো। আর একটু শায়লাকে বুক রাখতে ইচ্ছে করছে। মেজাজ খারাপ করে দরজা খুললাম। দরজা খুলতেই - ‘ভাইজান, কয়ডা চাইল দ্যান। আল্লাহ আপনারে সওয়াব দিবো।’

মাথায় রক্ত উঠে গেল, বললাম - ‘নিচে দারোয়ান নেই?’
লোকটি বলল - ‘না ভাইজান, দারোয়ান ব্যাটায় চা খাইবার লাগছে, সুযোগ পাইয়া ডুকছি ভাইজান। কয়ডা চাইল দ্যান, চইল্লা যাই।’
- ‘তুই এখনই বের হ, বাসায় ঢোকর সাহস পেলি কিভাবে, তুই। হারামজাদা, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস, বের হ।’
চমকিয়ে উঠলো ভিক্ষুকটা, বলল - ‘দিবেন না কইবেন, গাইল দ্যান ক্যান।’
- ‘শুয়ার, এখনো দাঁড়িয়ে আছিস।’

তাকে টেনে বাসা হতে নামালাম। লোকটির সমস্ত দিনের রোজগার পড়ে গিয়েছে। নিচে আসতেই দারোয়ান হাজির হলো। ভিক্ষুককে ঘাড় ধরে বের কও গেট আটকিয়ে দিল। তাকে গালাগালি করলাম। বললাম - ‘আজ থেকে তুই এখানে থাকবি না। তোর চাকরি নট।’

বয়স্ক লোকটি আমার পাঁ জরিয়ে ধরলো। তার পেটে একটি লাথি মেরে বললাম - ‘এই শুয়ার, গায়ে হাত দিবি না।’ লাথিটা জোরে হলো, সে আহ করে উঠে সরে গেল। গেটের বাইরে ভিক্ষুকটা কান্না করতে ছিল। বলতে ছিল, ভাইজান চাইলগুলো ফেরত দ্যান। আমি উপরে উঠার সময় শুনতে পেলাম সে আমাকে অভিষাপ দিচ্ছে। অভিষাপ দিচ্ছে দিক, গরিবের দল কেবল অভিষাপ দিতেই পারে। কেননা, তাদের অভিষাপ দেবার তো কেউ নেই।



শায়লা মারাত্মক চোখে টি.ভি দেখছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, টি.ভি পূজা চলছে আমার বাসায়, শায়লার চোখ নড়ছে না। আমিও এক নজর তাকালাম টি.ভির দিকে। লাশ নিয়ে গবেষণা চলছে সেখানে। একটি মেয়ের লাশ। জলের শোষণে পঁচে গিয়েছে তার দেহ। মাংস গুলো বিচ্যুত হয়ে হাড়ভিড বেরিয়ে এসেছে। লাশটিকে ঘিরে থাকা জনস্রোত নাসিকা-মুখ ঢেকে আছে। বাচ্চারা ভয়ে মা অথবা বাবাকে জড়িয়ে আছে। টলিটি পেয়েছে এক জেলে। বার বার ক্যামেরার সামনে আসার চেষ্টা করছে জেলেটা। দাঁত বের করে মাঝে মাঝে হাসছে। ক্যামেরার সামনে হাসি দিয়ে বলছে -‘হ, আমি সামসুল করিম। লাশটা আমিই পাইছি। হে হে হে।’ সাংবাদিকরা প্রশ্ন করছে -‘এখন আপনার কেমন লাগছে সামসুল ভাই?’

-‘ভাল লাগতাকে আপা, লাশটা যখন দ্যাখলাম পিত্তের পানি হুগাই গেছিলো। আমি কি ভাবছিলাম জানেন নি, ভাবছিলাম গুপ্তধন পাইছি।’

-‘কিভাবে লাশটা পেলেন আপনি?’

-‘আর কইয়েন না আপা, হালার কপালডাই খাপার। নদীতে নাই মাছ, হারাদিন জাল খেওয়াই। আপা নদীতে মাছ নাই এইডা নিয়া কিছু কমু? ট্যাকা পয়সা নাই, দ্যাখেন আমার পোলাপাইনের কি অবস্থা। খারান দ্যাহাইতেছি, কৈ-রে মানিক্কা, এমনে আয় তো, তোর বুইনডারে নিয়া আহিস, আপা তোগো টিপিতে দ্যাহাইবো। ব্যাটা নায়ক হইয়া যাবি, দৌর দে।’

বাচ্চা দুইটা সাথে সাথেই চলে আসলো। মহিলা সাংবাদিক তাদের জিজ্ঞেস করছে, তোমাদের কেমন লাগছে, ভয় পাও নি তো। তোমরা প্রথমে কি দেখলে ইত্যাদি। বাচ্চারা বলছে, আমরা লাশ দেইখা খুশি হইছি। সংবাদটি আমার কাছে এক মর্মস্পর্শী আর্টফিল্লোর মত লাগছে। অস্কার পাবার মত সংবাদ এটি। নাম দেয়া যেতে পারে, নদীর বুকে পঁচা কুমারী অথবা জেলের জালে লাশ। লাশটি দেখেই চিনেছি আমি, এটা মাওয়া। তিন মাস পরে তাকে উদ্ধার করা হলো। তাই বাংলাদেশের উপর রাগ লাগলো। ছি, বাংলাদেশ এত ধীর গতিতে চলছে। মাওয়াকে চেনা যাচ্ছে না বলে, সংবাদটি এক ট্রাজেডির জন্ম দিয়েছে। এই ট্রাজেডি পূর্ণ আর্টফিল্লোর একমাএ ভিলেন আমি। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম লাশটি দেখে। এখন অবশ্য হাসিই লাগছে, কারন মাওয়াকে চেনা যাচ্ছে না তাই জেলে যাবার ভয় নেই। এর চেয়েও বড় কাথা, এখন চলছে গরম গরম জেলেখি



বিতরন। কোন চ্যানেল কার আগে বিতরন করতে পারে জনগনের কাছে। জেলেফি ঠান্ডা হবে, খাবে তা মাছি, এটাই প্রধান কথা। তাই আমি, ভিলেন সাজু, বেঁচে গেলাম। শায়লা বলে উঠলো - ‘সাজু, মেয়েটাকে কেমন চেনা লাগছে।’

- ‘কি বাজে কথা বলো, মেয়েটার তো মুখই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।’

- ‘হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে না, তবুও কেন যেন মনে হচ্ছে মাওয়া।’

- ‘পাগলের মত কথা বলো না শায়লা। তোমার কি হচ্ছে আমি বলি, তুমি ভাবছো মাওয়া হারিয়ে যায় নি। আর তার সাথে সাথে ভাবছো, আমি তাকে মেরে ফেলেছি। শোন শায়লা, মাওয়া সত্যিই হারিয়ে গেছে। আর যে হারিয়ে যায়, সে কিভাবে এই টলিতে আসবে, বলো?’

শায়লা টি.ভির সামনে চলে গেল। সাংবাদিক ভাই বোনেরা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখাচ্ছে মাওয়ার লাশ। কেন যেন মনে হচ্ছে, শায়লা চিনে যাবে মাওয়াকে। এবার বিরক্ত লাগছে। আমি টি.ভি বন্ধ করে দিয়ে, শায়লার কাঁধে হাত রাখলাম। তাকে বললাম - ‘শায়লা, বাজে চিন্তা রাখো। তোমাকে একটা কথা বলি?’

শায়লা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল - ‘বলো?’

- ‘ফিরে আসো না আবার।’

- ‘হু।’

নিশ্চুপে, নিব্রিতে সম্মতি দিল শায়লা।

লেখা-৭

বিবাহিত জীবন খুবই আনন্দের, যদি প্রেম থাকে। প্রেম থাকলেও আনন্দের হয় না অনেকের জীবন, কারন তারা আনন্দের মানি বুঝে না। আনন্দ মানি, প্রজাপতি দেখা হতে পারে আবার ড্রাগন দেখাও। এখন যদি এদের জীবন্ত দেখার মাঝে কেউ আনন্দ খুজে, তবে ঢাকার মানুষ দুঃখী, এখানে কিছুই নেই। প্রজাপতি থাকলেও তা সবার জন্যে নয়, কেবল বৃষ্টি প্রেমিকদের জন্যে। তাহলে ঢাকার মানুষ কি অসুখি, মোটেও নয়। ঢাকার মানুষ তাঁরা সুখি, যারা প্রজাপতি অথবা ড্রাগন টি.ভিতে দেখে আনন্দিত। আর আমি সেই আনন্দিত পুরুষদের মধ্যে একজন। শায়লা আর আমার সংসার কিছুদিনের মধ্যে পূর্ণতাপাবে। শায়লা আমাদের সৃষ্টিকে ধারণ করেছে। প্রথম সন্তানের আশায় বসে



থাকা, অন্য রকম অনুভূতি। শায়লা এডিকটেড এখন আমি। তাকে দেখাশুনা করাই আমার প্রধান কাজ। বাসায় বিড়াল প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ। পেঁপারে পড়েছি, বিড়াল থেকে টক্কোপ্লাজমোসিস রোগ হয়। এই রোগ হলে, বাচ্চার হৃপিড়, ফুসফুস, চোখ, যকৃত ইত্যাদি মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে নাকি মৃত সন্তান হতে পারে। তাই বিড়াল প্রবেশ নিষেধ।

শায়লার সাথে বসে চা খাচ্ছি। বিকেলের ঠান্ডা পরিবেশে বারান্দায় বসে চা খাওয়া আর শায়লার মুখে কবিতা শোনা, নেশা হয়ে গেছে। আজকের চা আমি বানিয়েছি। এখন চা বানানো শিখে গেছি। নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টায় ব্রত আমি। হয়তো পারবো, আশা রাখা যায়। কলিংবেল বেজে উঠলো। কিছুটা বিরক্ত মুখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম, শায়লাকে বারান্দায় রেখে। এক বৃদ্ধ লোক এসেছে, সাদা পাঞ্জাবিটা কেজি পরিমাণ ময়লায় পূর্ণ। পায়ের স্পঞ্জটিও বৃদ্ধ হয়ে গেছে। মুখে ছোট ছোট সাদা দাড়ির বাগান। বললাম - ‘একটু দাড়ান, টাকার ব্যাগটা ভিতরে, নিয়ে এসে ভিক্ষে দিচ্ছি।’

- ‘যে-না ছ্যার, আমি খরাতি না।’

- ‘তাহলে কে আপনি, কাকে চান?’

- ‘ছ্যার, আমি আব্দুল ছত্তার।’

নামটা বলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। দাঁত তার পানের দাগ দিয়ে সুসজ্জিত। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম - ‘বুঝলাম আপনি আব্দুল ছত্তার, এখন আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?’

- ‘ছ্যার, আমি মাওয়ার বাপ, আমারে বাঁচান ছ্যার!’

ছত্তার কান্না শুরু করে দিল। সে আমার পাঁ শক্ত করে ধরে আছে। আমি ছাড়াতে পারছি না, শক্তি আছে তার শরীরে। ঘাড় ধরে তাকে বিদায় করতে পাড়লে ভাল লাগতো। কিন্তু তাও পারছি না। আবার সেই মাওয়ার অধ্যায়। মেয়েটা তেঁ আমারে ছাড়ছেই না। ছত্তারের কান্না আস্তে আস্তে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রূপ নিচ্ছে। তার কান্না শুনে শায়লা এসে পড়লো। রুম্ম কণ্ঠে বলল - ‘সাজু, তুমি আবার শুরু করেছো। তুমি কি কখনো চেঞ্জ হবে না? হি সাজু, এক বৃদ্ধ মানুষকে দিয়ে তোমার পাঁ ধরিয়ে রেখেছ।’



-‘আমি কিছুই করি নি, লোকটি নিজে থেকে আমার পাঁ ধরে আছে। আমি চাইলেও পাঁ ছাড়াতে পারছি না, তার হাত লোহার মত শক্ত।’

-‘তাহলে তিনি কান্না করছেন কেন?’

-‘তুমি তাকেই জিজ্ঞেস করো, তার আগে আমার পাঁ ছাড়াতে বলো, দয়াকরে।’

-‘এই যে, আপনি সাজুর পাঁ ছাড়ুন চাচা। কি হয়েছে আমাকে বলুন?’

পাঁ ছেড়ে দিল ছত্তার। কান্নার শব্দটাও কমে গেছে তার। শায়লাকে সে চিনে। শায়লা তাকে মনে করতে পারছে না। তবুও মাওয়ার বাবা শুনে তার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলছে। আমিও শায়লার পাশে বসে তাদের কথা শুনছি। শায়লা বলল

-‘চাচা, কেমন আছেন আপনি, কি মনে করে আসা ঢাকাতে?’

-‘ভালা নাইরে মা, ভালা নাই। যাওয়ার কোন জায়গা নাই আমার। মাওয়ার কতা চিন্তা কইরা তোমাগো বারিত আইলাম। কৈ মা, আমার মাইয়াডারে দ্যাখতাছি না, হ্যারে একটু দাহো মা।’

আমরা দু’জনে নিরব। কি বলবে শায়লা তাকে। শায়লা বারেবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। ছত্তার জিজ্ঞেস করলো -‘মা রে, কোন সমস্যা হইছে? তোমরা কতা কও না ক্যা?’

আমি বললাম -‘হ্যা, সমস্যা তো একটা আছেই। আপনার মেয়ে বাসা হতে পালিয়ে গেছে। তাকে অনেক খোঁজা হয়েছে, পেঁপারেও বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি। সে কি আপনাদের কাছে যায় নি?’

আব্দুল ছত্তার বাকবন্দী এখন। তার চোখ মুখ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। সে আবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ধরলো, কান্না ধরার আগে বলে নিল, হায় আল্লাহ, এ তুই কি করলি! বদ লোক কোথাকার, এতদিন মেয়ের কোন খোঁজ নেয় নি, এখন ভালবাসা বেয়ে বেয়ে পড়ছে তার। নির্ঘাত কোন বদ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। কান্নার অভিনয়টাও ঠিক করে হচ্ছে না তার। ইচ্ছে করছে, ঠাস করে চর লাগিয়ে দেই। চর খেয়ে সব ন্যাকামি ছুটে যাবে। কিন্তু পারছি না, পরিবর্তন হচ্ছি যে আশ্রি। শায়লা ছত্তারের গায়ে হাত রেখে বলল -‘চাচা, কেঁদেন না। কি হয়েছে, বলুন আমাকে?’

চোখ মুহুতে মুহুতে বলল -‘কি কমু মা, আর কিছু রইলো না রে আমার। একেবারে সর্বশান্ত হইয়া গেছি আমি। চোহের সামনে ব্যাবাক শুলা রে বকিমানে



নিয়া গ্যালো, শ্যাঘটারেও নিয়া গ্যালো। বুকটার ভিতরে পাতুর দিল না ক্যান
আল্লায়। হ্যেয় কি তামশা করে, তামাশা করে হ্যেয়।’

-‘চাচা কাঁদবেন না, বলুন কি হয়েছে। আমরা তো আপনার সন্তানের মতই।’

-‘মা, গরিব গো জন্মাইতে হয় না, সবাই মুক ফিরায় লয়। তোমারে কি কমু কও
মা?’

-‘যা হয়েছে সব বলুন।’

আব্দুল ছত্তার তার জীবন কাহিনী বলতে লাগলো। অশিক্ষিত, গন্ডদের কিছু
বলতে বলা মানি, রাজ্যের ইতিহাস। ছত্তার তার ইতিহাস বলতে লাগলো। ব্যাটা
এসে ঝামেলার সৃষ্টি করেছে খুব।

ছত্তারের কাহিনী

মা রে, একটা ইচ্ছা ছিল বুকো। সবটি ছাওয়াল নিয়া কয়ডা ডাইল ভাত খামু।
সবাইরে বারিত নিয়া আইলাম, বাকি ছিল মাওয়া। কাইল যামু তারে আনতে,
তাই সবাইরে নিয়া ঘুমাই পড়লাম সন্ধ্যা সন্ধ্যা। রাইতে আসমান ম্যাঘে ভইরা
উঠলো। বিবালি খ্যালতাছে আসমানে, ওরে কি খ্যালা! বাতাস বইতাছে হু হু,
পরানডা কাল কইরা দিল বাতাসে। ঘুম ভাইগা গেল আমার। বউ কইলো - ‘কৈ
যাও এত রাইতে। বাইর হওনের দরকার নাই, জন্মের একটা ঝর হইবো।’

আমি কইলাম - ‘ধুর বেডি, ঝর রে ডর করলে চইলবে, গাঙ্গে আইজ ম্যালা মাছ
পাওন যাইবে, তা জানোস নাই? সব ছাওয়াল গুলা আইতাছে, তাগো মুহে ভালা
খাওন দিতে পারলে শান্তি লাগবো, তুই গামছাডা দে, বাইরাই পিরি।’

ক্যান জানি মনে হয় গাঙ্গ আমারে ডাহে। হেই কি ডাক তার, কয় ছত্তার মিয়া
ক্যান দেরি করো, মাছ তো ব্যাবাক নিয়া গ্যালো ওরা। বাইরাই পরলান হাত্ত
হারিক্যান নিয়া। একটু দূরে বজলু মিয়াও দাড়াই রইছে। কইলো - ‘কি মিয়া,
বাইর হইছো, লও...লও তাড়াতাড়ি লও, গাঙ্গে আমাগো জইন্যে উতলা হইয়া
গ্যাছে।’

-‘হ মিয়া ভাই, যাওনের জন্যেই তো বাইর হইলাম। গাঙ্গের মাঝে, গাঙ্গের ডাহে
বাইর না হইয়া পারি, কন?’



-‘ঠিকই কইছো মিয়া। লও, একলগে যাই আইজ।’

রাইতের আসমান এক্কেবারে কালা হইয়া আছে, হ্যার লগে পাতালও। মাঝে মইধ্যে বিঝলি চমকায় আবার আমাগো কানা কইরা দেয়। দূরে জোঁনাক পৌঁহের মত দ্যাহা যাইতাছে আলো। এই আলোগুলা অন্যগো হারিক্যানের আলো। ধীরে ধীরে আলোগুলান হারাই গ্যালো, সবাই দূরে চইল্লা গ্যাছে। আমাগো নাও বাওন লাগতাছে না। বাতাস নিয়া যাইতাছে আমাগো নাও। কাল বাতাস বইতাছে, বিষ্টি এহনো শুরু হয় নাই। নাওয়ের লগে ঢেউ বারি খাইতাছে, তাগো ছন্দে কি সুন্দর আওয়াজ। মনে হয়, নাওডা পানির লগে পিরিত করতাছে। কহন জানি, গাঙ্গের মাঝে চইলা আইলাম। বজলু কইলো -‘ছত্তার ভাই, নাওডারে কিনারে লইয়া চলো, টানা দিয়া মাছ ধরম আইজ।’

-‘আইছা লও তাইলে, কিনারের দিকেই যাই। দুই ভাই মিলা আইজ জব্বর মাছ ধরম।’

নাওডারে কিনারে লইয়া গ্যালাম। কাছা দিয়া নাইমা পরলাম গাঙ্গে। নাওডা ক্যামন জানি করে, থাকবার চায় না এইহানে। খালি চইলা যাইবার চায়। কৈ যাইবার চায়, ক্যান যাইবার চায়, বুঝি না। নাওডা কি বারির দিকে যাইবার চায়। নাওডা কিছু কৈতে চায়। হ্যার তো মুখ নাই, পরান নাই। নাওয়ের মুখ থাকলে মনডা কয়, সর্বনাশটা হইতো না। নাওয়ের লগে যে, গাঙ্গের আত্মার পিরিত। হ্যায় তো ঠিকই বুঝবার পারছে। নাওডার ওমন ছটফটানি কামে বন্ধক দেবার লাগলো। দড়ি দিয়া মাজায় বাইন্কা লইলাম তারে। মাঝে মইধ্যে মাজায় টান পরে, যাইবার কয়, হ যাইবার কয় নাওডা আমাগো।

কত মাছ যে ধরলাম, তার কূল নাই। গাঙ্গে এহনো ম্যালা মাছ যে আছে, জানতাম না! মাছ ধরতে ধরতে তুফান শুরু হইয়া গ্যালো। বিষ্টিও শুরু হইয়া গ্যাছে। বজলু কইলো -‘মিয়া ভাই, ম্যালা মাছ ধরছি, লও খিধা লাগছে কয়ডা খাইয়া লই।’

-‘হ চল, কয়ডা খাওন লাগে। বিষ্টিও আইয়া পরছে, খাইতে খাইতে বিষ্টিভা কমুক একটু।’

আমাগো দুই ব্যাডার বুহে খুব সুখ। কালা দেহের পশম দাড়াই উঠছে কাল বাতাসে। নাওয়ের ছাইনীর তলে ডুকলাম। হারিক্যানডা মিট মিট করতাছে। বজলু আগুন বারাই দিল। লুঙ্গির তলের পানি চিপরাইয়া কোমাইতে কোমাইতে কইলো।



-‘ছত্তার ভাই, পদ্মারে খালি ডর করে। খালি চিন্তা করি, কহন জানি খাইয়া হালায় আমাগো।’

-‘ধুর ব্যাটা, ডরের কিছুই নাই। পদ্মা তো আমাগো মা, হ্যারে ডর করলে চলবো, চলবো না। ছোড থিকা বড় হইছি পদ্মার বুহে, পদ্মা আমাগো ভালই চাইবো, বুঝলি?’

-‘হ ভাই, বুঝলাম। তবুও খালি মনে পইরা যায় হেই কতা, তোমরা ছিলা তহন এই পারে। আমাগো ওই পার ক্যামনে ভাঙ্গছে দ্যাহো নাই, আমি দেখছি। বাপের লগে গ্যালাম মাছ ধরতে, তিন দিনের সফর। জীবনের প্রথম মাছ ধরতে যাওয়া আমার, কত যে খুশি ছিলাম। মায় যাওয়ার সময় গামছা দিয়া মুখ মুছাই দিয়া কইলো, বজলু বাবা, চ্যাংরামি করবা না। তোমারে ভাল জেলে হইতে হইবো। মায় আমারে বিদায় দ্যাওনের সময় কানতে লাগলো, জানি আমি একেবারে চইল্লা যাইতেছি। মায়ে কপালডায় চুমা দিয়া আমারে যাইতে কইলো। যতক্ষন মায়েরে দ্যাহা যায়, ততক্ষনই দ্যাখলাম। হেই দ্যাহাই শ্যাষ দ্যাহা, মায়ের কতা এহনো মনে পরলে কান্দি রে ভাই। ছত্তার ভাই, দ্যাহো দ্যাহো, আমার চোহে পানি আইয়া পরছে।’

-‘হেই কতা মনে কইরা লাভ নাই বৈজলা, কানলে কি হইবো, কান্দিস না। নে বিড়ি খা, আর হোন, পদ্মা ভাঙ্গন বাদ দিয়া দিছে। ডরের কিছু নাই, চিরা খাবি রে, বউডা আমার চিরা দিয়া দিছে।’

-‘দ্যাও খাই।’

ডরাইলে কি হইবো, ডর তো আমারও করে। পদ্মা ভাঙ্গলে কাপাল খারাপ, আর কি। মনে আইজ এক আসমান সুখ, গীত হুনতে ইচ্ছা করতাছে। বজলু গীত গাইবার পারে। তয়, জোরে টান দিবার গ্যালে গলা ফাইটা যায়। তাতে কি, গীত হুনবার পারলেই হইলো। বজলুরে কইলাম -‘বজলু, একটা গীত ধরোস দেহি। মনডায় গীত হুনবার চাইতাছে।’

বজলু হাইসা কইলো -‘হুনতে চাইবোই তো, এত মাছ কি পাইছি কহোনা আমরা, পাই নাই। আইজ গীত হুনতে চাইবো না তো কবে চাইবো?’

গীত গাইতে লাগলো বজলু, গীতটা হুনতে মিঠা অনেক নাওয়ের হাল ছাইরা দিছি, নাওয়ের মনের মতো চলতাছে হে। গীতটা এহনো মন গাইয়া ওতে

“পদ্মারে তুই, নাওয়ের লগে ভালবাসা কর



আন্ধার হইছে আসমান আইজ, তোর বুকো বর
নাও লইয়া যামু রে তোর, নাও লইয়া যামু রে তোর
বুকোর গহবর ।
তুই, নাওয়ের লগে ভালবাসা কর ।”

গীতের মইধ্যে কার গলা জানি হুনে পারতাছি । কেডা জানি চিল্লাইতাছে । কি
কয় ব্যাডায় । বজলু গীত থামাই দিল । দুই জন তারাতারি নাওয়ের মাথায়
আইলাম । এইবার হোনা যাইতাছে, হ হোনা যাইতাছে । ব্যাডায় কয়, উত্তর পারা
নাহি পাদ্মায় গেলছে । কি কয় ব্যাডায়, আমাগো মাথা ঘোরতে লাগলো । নাও
বাওন লাগছি, দুই জনের সব শক্তি দিয়া বাইবার লাগছি । নাও ক্যান যায় না ?
ক্যামনে যাইবো, তারাতারির কামই তো আস্তে হয় । মাঝে মইধ্যে ইচ্ছা করতাছে,
হাতরাইয়া যাই । আমাগো চোখ এহন কিছু দ্যাহে না । পাশে জানি আরো কতো
নাও আছে । সবাই কি উত্তর পারার, না-কি আরো পার ভাঙ্গছে । সব উত্তর পারার,
এক লগে দুই পার তো ভাঙ্গে না । বারির কাছে আইলাম, বারি কৈ আমার ?
ব্যাবাক গ্রাম পানি হইয়া গ্যাছে । সব গিল্লা নিতাছে পদ্মা । ঘোলা হইয়া গ্যাছে
পানি । লাফাই নামলাম গাঙ্গে, আমার পরিবার কৈ । ডোবাডুবি করতাছি, কি
খুজতাছি আমি । নাই, কেউ জিন্দা নাই । সন্ধ্যা গাঙ্গের খাওন হইয়া গ্যাছে ।
আমি কি করমু, কেস করমু পদ্মার নামে ? আগুন লাগাই দিমু ? বিচার বহামু ?
নিজের হাতে খুন করমু, কি করমু ওরে ? গাঙ্গে কান্দনের মেলা বইয়া গ্যালো । ঐ
তোরা কেউ আমার কান্দন দ্যাখ । বজলু তার বউ আর পোলাডারে পাইছে ।
বাঁইচ্ছা আছে অরা । সিদ্দিক, আবুল, মোতালেব আরো কত জনের পারিবার
খুইজা পাইছে । আমার গুলা গ্যালো কৈ ? পদ্মাই জানে, বাঁইচ্ছা আছে না মরছে ।
আর থাকবার পারলাম না মা, মাইয়াডার কতা মনে পরলো, তাই আইয়া পরলাম ।
এহন দেহি, মাইয়াডাও আমার নাই ।

মন খারাপ হয়ে গেল আমার গৃহিনীর । ছত্তারের গল্পটা অত্যাশ্চর্য করন ।
বউয়ের চোখে জল চলে এসেছে । আব্দুল ছত্তারও ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করছে ।
গল্পটা শুনে আমি যা বুঝতে পারলাম তা বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, ছত্তার
বলতে চাচ্ছে, আমাকে আপনারা কাজে রাখুন, আমার যাবার জায়গা নেই । সুযোগ
পেলে আপনাদের বাসা সাফ করে ফেলবো । আমাকে জে চিনেন না, আমি হুমায়



শয়তানের ওস্তাদ। একবার শুধু পারমিশন দিয়ে দেখেন, আমি যে কি করবো তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। গরীবের জাত মানি, এক একটা বিটলা।

শায়লা খুবই করুণ কণ্ঠে বলল -‘চাচা, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি আমাদের সাথে থাকবেন, আর আমাদের ছেলে মেয়ে বলে জানবেন। আপনার কোন সমস্যা হবে না চাচা।’

-‘মা রে, আমারে বাঁচাইলেন।’ বলেই শায়লার পাঁ ধরতে গেল ছত্তার, কিন্তু শায়লা ধরতে দিলো না। শায়লা তাকে মাওয়ার রুমটায় থাকতে বললো। হুট করে এমন একটি সিদ্ধান্ত শায়লার নেয়া ঠিক হয় নি। ছত্তার মাওয়ার রুমে চলে গেল। শায়লাকে বললাম -‘তুমি এভাবে তাকে বাসায় থাকতে বললে কেন? লোকটিকে কিছু টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিলেই হতো।’

-‘এটা কেমন কথা সাজু, লোকটি এখন অসহায়। এছাড়া তার মেয়েটা আমাদের এখান থেকেই হারিয়ে গেছে, কেন তবে তাকে থাকতে দেয়া যাবে না?’

-‘হারিয়ে যায় নি, বলো পালিয়েছে। আর লোকটা যদি চোর হয়?’

-‘তোমার তো ঐ একটা সমস্যা, লোকটা গরীব এই তো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাকে আমি থাকতে মানা বলে দেই।’

-‘রাগ করছো কেন, ঠিক আছে উনি থাকবে।’

-‘শোন, ছত্তার চাচা মনে হয় কিছু নিয়ে আসে নি সাথে। একটা কাজ করো সাজু, তাকে তোমার পুরনো কিছু জামা দিয়ে এসো, যাও। আর, আজ তার জন্যে নতুন পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি কিনে আনবে।’

-‘বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না শায়লা?’

-‘মোটোও না, তুমি যাও তাকে দিয়ে এসো। আমি তার জন্যে কিছু খাবার বানিয়ে নিয়ে আসি।’

-‘ওকে যাচ্ছি, কিন্তু সাবধানে কাজ করো। আর কিছু লাগলে আমাকে বলো, কোন বিপদ যেন না হয়।’

-‘আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে।’

ছত্তারের জন্যে জামা নিয়ে এসেছি। আমাকে দেখা মাএ বলল -‘আহেন বাবা, আপনে ক্যান কষ্ট করলেন? আমারে কইলে তো নিয়া আইতে পারতাম।’

তার গায়ে জামা ছুড়ে বললাম -‘আমাকে বাবা টাকা বলবে না, স্যার করে আনবে। আর শোন, এ বাসায় থাকলে কাজ করতে হবে। শায়লাকে সাহায্য করবে। তোমাকে জামাই আদর করে খাওয়াতে রাখা হয় নি, বুঝেছ আমার কথা?’



-‘হ বাবা, থুকু, হ ছ্যার বুঝছি। ছ্যার, একডা কতা জিগাই?’
-‘না, কোন কথা না। চুপ করে থাকবে সব সময়। কথা বেশি বললে, ঘাড় ধরে বের করে দিব।’
ছত্তারের মুখ চুপসে গেল। এটা তো কিছুই করলাম না। আমি পরিবর্তন না হলে, অনেক আগেই ঘাড় ধরে বের করে দিতাম। আব্দুল ছত্তার বেঁচে গেল, আমার হিংস্রতা থেকে। তার ভাগ্য আছে বলতে হবে।

লেখা-৮

থ্যালাসেমিয়া মারাত্মক ব্যাধি। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে এই রোগ হয়। বংশগত রোগের মধ্যে না-কি, এটাও একটা। শায়লার তবে কেন হলো? ডাক্তার বলছে, হয় সন্তান নয় শায়লা। আমিও বলে দিয়েছি, শায়লাকে বাঁচান, গাছ থাকলে ফল হবে। ডাক্তার বলেছে, সন্তান নেয়া নাকি একদম ঠিক হয় নি। জীবনের ঝুঁকি বেঁচে গেছে শায়লার। শায়লার বিটা থ্যালাসেমিয়া হয় নি, হয়েছে আলফা। ভুল করেছি, ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে বাচ্চা নেবার চিন্তা করা উচিত ছিল। হাসপাতালে বসে আছি, সমস্ত দেহে টেনশন খেলা করছে। ডাক্তারদের ঘণ ঘণ দৌড়ানো আরো বেশি ভয়ের সৃষ্টি করছে। শায়লার বাবা, মা, বোন, আব্দুল ছত্তার সবাই উপস্থিত এক্ষণে।

অপারেশন ঘন্টা দুই ধরে চলছে। এতক্ষণ কি করে ডাক্তার মহাদয়, খুব জানতে ইচ্ছে করছে। তাঁরা কি বই পড়ছে ভিতরে? হয়তো একটু বই পড়ছে আবার অপারেশন করছে, আবার দেখে নিচ্ছে এর পরের ধাপ, আবার অপারেশন করছে। রাগে মাথা দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। বাংলাদেশ কি সত্যিই ডিজিটালের দিকে যাচ্ছে? একজন সেবিকা এসে জিজ্ঞেস করলো -‘পেশেন্টের হাসবেন্ট কি আপনি, স্যার?’

দাঁড়িয়ে বললাম -‘হ্যাঁ আমি, কি অবস্থা ওর, সব ঠিক আছে তো মিস?’
-‘হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। টেনশনের কোন কারন নেই, কিন্তু আপনার বাচ্চাটাকে আমরা চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারি নি, সরি ফর ছে।’
-‘না, ঠিক আছে। আমি আগেই জেনেছি, সে বাঁচবে না। শায়লার কি অবস্থা?
আমি কি তাকে দেখতে পারবো?’



-‘সরি স্যার, এখন দেখতে পারবেন না। যখন পারবেন, আমি নিজেই আপনাকে ডেকে নিব।’

-‘তাহলে বাচ্চাটাকে?’

-‘না, তাকেও পারবেন না।’

শায়লার বাবা দৌড়িয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো -‘আচ্ছা, ছেলে হয়েছিল না-কি মেয়ে?’

-‘জি স্যার, মেয়ে হয়েছিল।’

বালিকা সেবিকা চলে গেল। হসপিটালে একটা চাপা কান্না ভর করেছে। সবাই কান্না করছে, সবার চোখ বেয়ে জল নামছে, তবুও কোন শব্দ নেই। মেয়ে হবে আমি ভেবে রেখেছিলাম। আল্টাসনুগ্রাম করাই নি আমরা। আগে থেকে চেকআপ করানো মানি, একটা আনন্দ হারিয়ে ফেলা। বাচ্চা মারা গেছে, কিন্তু মেয়ে হয়েছে শুনে আনন্দ পেলাম। সেই আনন্দে চোখ ভিজে যাচ্ছে। মেয়েটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তার কপালে একটি চুম খেতে ইচ্ছে করছে। তাকে বলতে ইচ্ছে করছে, খুকি, তোমাকে একই সাথে স্বাগতম এবং বিদায়।

মেয়েটাকে দেখেছিলাম, অদ্ভুত সুন্দরের অধিকারি হয়েছিল সে। তার কারিগর তাকে দিয়েছিল, সবুজের মত সুন্দর লাবন্যতা। পৃথিবী হিংসা করে তাকে ফিরিয়ে দিল। পৃথিবীর চেয়ে সুন্দর কিছুকে পৃথিবীর ঘৃণা করা-ই সাভাবিক। ও পৃথিবী, যাদের ফিরিয়ে দিতে হয় তাদের দাও, কেন নিস্পাপকে হিংসা করো। শায়লার এখনো জ্ঞান ফেরে নি, খুব কষ্ট পাচ্ছে বউটা। তার চোখের দু’দিকে জলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। যেন সদ্য মরা নদী, তার জলের দাগ এখনো রয়ে গেছে। শায়লার পাশে বসে আছি আমি। শায়লার মা পিঠে হাত বুলিয়ে বলল - ‘বাবা, সারাদিন তুমি কিছু খাও নি। যাও খেয়ে নাও, আব্দুল ছত্তারকে দিয়ে খাবার আনিয়েছি। আর একটু বাইরে থেকে হেটে এসো, এভাবে বসে থাকলে তোমার শরীর খারাপ করবে।’

-‘না মা, খেতে ইচ্ছে করছে না। বরং আপনারা খেয়ে নিন।’

-‘তাহলে একটি কাজ করো, তুমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। বিছানা করে দেই?’

-‘আপনার কিছু করা লাগবে না মা, আপনি আমাকে একটু বুকে ধরে থাকেন। আমার মায়ের কথা খুব মনে পরছে।’



শাশুড়ি কেঁদে দিল কথা শুনে, আমিও যে কাঁদছি না তা নয়। সে আমাকে জোরে বুকের মাঝে জরিয়ে ধরে আছে। মায়ের কথা এখন আর মনে পরছে না। এইতো আমার মা, আমার মা তো আমাকে এভাবেই আদর করতেন। মা তার নিজ হাতে আমাকে খাইয়ে দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম, এতদিন আমি অভাগা ছিলাম। গাঁধা শ্রেনীর মানুষ ছিলাম। এমন আদর কেউ হারাতে চায় না। মা আমাকে আদর করে বললেন -‘সাজু, যাও বাবা, একটু হেঁটে এসো নিচ থেকে, ভাল লাগবে। আর আমি তো আছি, শুধু শুধু টেনশন করো না।’

হসপিটালের নিচে চলে এসেছি আমি। হাঁটতে হাঁটতে প্রধান সড়কে চলে এসেছি। কিন্তু ঢাকার সড়ক পুরোপুরি খালি। আমি রাস্তার এক পাশে বসে। মাঝে মাঝে গাড়ি শো শব্দ করে চলে যাচ্ছে। রাস্তার সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অতি কষ্টে আমি হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছি। রাস্তাকে প্রশ্ন করার আগেই সে করলো -‘সাজু ভাই, কেমন আছেন?’

-‘ভাল, খুব ভাল আছি।’

-‘মিথ্যা কথা বলবেন না, ভাই। আমি সারাদিন মিথ্যা শুনতে শুনতে ক্রান্ত, কোটি মানুষের ভিতর কোটি মানুষই মিথ্যা বলে। দুই-একজন ভাল মানুষ পাইলে ভাল লাগতো। বলেন, মন খারাপ কেন আপনার?’

-‘আমার মেয়েটা মারা গেছে ভাই। বউটাও মহা বিপদের মাঝে আছে। আচ্ছা সড়ক ভাই, আপনারও কি আমার মত মন খারাপ?’

-‘কেন বলুন তো, আপনার কেন মনে হলো আমার মন খারাপ?’

-‘এই যে, আজ আপনার গায়ের উপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে না। আপনাকে খুব খালি খালি লাগছে, তাই?’

-‘নাহ, আমার মন রাতে খুব ভাল থাকে। শুধু, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর ইত্যাদি বিভিন্ন তারিখে আমার মন খুব খারাপ থাকে। আমি গাড়ি চাই না, আমি চাই ফাঁকা শহর।’

-‘অদ্ভুত তো, আপনার সাথে আমাদের কোন মিলই নেই। আপনি বেগি প্রভে মন খারাপ করেন আর আমরা হারালে মন খারাপ করি। আপনি মিথ্যা ভালবাসেন না আর আমরা মিথ্যার মাঝে বসবাস করি। একটি সত্যি কথা শুনবেন সড়ক ভাই?’

-‘হ্যাঁ, শুনবো। তবে আমার মনে হয়, আমি জানি আপনি কি বলবেন। আপনি কি বলতে চান, আপনি একজন খুনি? আপনি মাওয়াকে খুন করেছেন?’



-‘সড়ক ভাই, এই খবর আপনি কিভাবে জানলেন?’
-‘২৭/০৫/২০১২ তারিখ আপনি তো আমার উপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলেন, সাজু ভাই। মেয়েটাকে হয়তো বুড়িগঙ্গায় ফেলেছিলেন?’

আব্দুল ছত্তারের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে আমাকে ডাকছে, যে ডাকের ভিতরে একটা ভয় লুকিয়ে আছে। আমি একটু এগুতেই শুনতে পেলাম -‘ছ্যার, শায়লা মা ক্যামন জানি করে।’ দৌড়ে গেলাম শায়লার কাছে। ডাক্তার ততক্ষণে উপস্থিত হয়ে গেছে। সবাই আবার টেনশনে পড়ে গেলাম। শায়লাকে পুনরায় ও.টিতে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার মাথা উচু করে বেরিয়ে, আমার কাছে এসে ক্ষণিকটা নিচে নামিয়ে বলল -‘সরি মিঃ. সাজু, বাঁচানো গেল না।’ হসপিটালে আরেক ধাপ কন্নার খেলা চললো। এবারের কন্নার শব্দ আছে, খুব শব্দ।

সকাল হতেই বৃষ্টি। দু’জনকে কবরে দিয়ে এসেছি। অনেক ক্ষণ বসে ছিলাম অযথা। আজ সারাদিন কাঁদবো। বৃষ্টি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ রাস্তায় হাটবো আর কাঁদবো। পাখি দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে তারা পালিয়ে আছে। আমি টি.এস.সি চওরে বসে। একটি রিক্সা আমার কাছে এসে থামলো। রাহুল আর মিথিলা। রাহুল আমাকে জিজ্ঞেস করলো -‘কিরে সাজু, কি খবর তোর? অনেক দিন পর দেখা, কেমন আছিস? এখানে কি করছিস, একা একা?’

-‘খুব ভাল আছি, বসে বসে কাকদের বৃষ্টিতে ভিজা দেখছি।’

-‘ভাল করছিস, তুই জানিস নাকি, আমি আর মিথিলা বিয়ে করেছি?’

-‘নাহ, জানি না।’

-‘তোকে তো খাওয়ানো হয় নি, চলে আসিস একদিন সময় করে। আর অর্ক তো জে.কের সাথে বিয়ে করে ফেলেছে। যখন জে.কের বাবাকে বললো, আঙ্কেল আমার এইডস হয়েছে, আমি আর বাঁচবো না। ব্যাটায় সাথে সাথে তার বন্ধু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল অর্ককে। অর্ক কি করবে বুঝতে পারলো না, মাস্তুর আর কপালে নিশ্চিত। শেষে জে.কের বাবাকে বললো, আঙ্কেল আমাকে এইডস হয় নি, আমি জোলিকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম সে আমাকে কেমিস ভালবাসে। আমি বুঝে গেছি সে আমাকে খুব ভালবাসে, আমার এইডস হয়েছে শুনেও বিয়ে করতে চেয়েছে আমাকে। আমি আজ-ই তাকে বিয়ে করতে চাই।’

মত জে.কের বাবা অর্কে চাওয়া পূরন করে দিল।’



-‘ও।’

মিথিলা সম্পূর্ণ অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। রাহুল আবার বলল -‘তা তোর সংসার কেমন চলছে, শায়লা ভালো আছে?’

-‘হ্যা, সে খুব ভাল আছে।’

-‘শায়লা কোথায়, আশেপাশে আছে না-কি? একা একা তো আসার কথা না তোর এখানে।’

-‘না, শায়লা আশেপাশে নেই। সে আর তার মেয়ে আজ ঘুরতে গেছে।’

-‘মেয়ে হয়েছে তোর, শালা একবার বললিও না। নাম রেখেছিস কি? কোথায় ঘুরতে গেল, তুই কেন গেলি না?’

-‘নাম রাখার সময় পাই নি, তার আগেই কবরে ঘুরতে চলে গেছে। আজ সকালে তাদের দুজনকে কবরে রেখে এসেছি। আমার যাবার সময় হলে, আমিও যাবো। আর কিছু জিজ্ঞেস করবি, না এখন আমি আসতে পারি?’

মিথিলা এবার আমার দিকে তাকালো, রাহুল হতভম্ব হয়ে গেল। আমি হাঁটা শুরু করলাম, কোথায় যাবো জানি না। হাঁটতে হাঁটতে নেশার রাস্তায় চলে আসলাম আবার। এবার নেশার রাস্তাটা বেশ প্রসস্ত। কেউ নেই এখানে, একমাএ আমি। বাসায় বসে নেশা করতে আর ভাল লাগে না, তাই উদ্যানে চলে আসা শুরু করি। প্রতিদিন আব্দুল ছত্তার আমাকে নিয়ে যায় বাসায়। নেশা এখন আমার জীবনের বড় পেশা।

লেখা-৯

Cannabis indica (গাঁজার বৈজ্ঞানিক নাম) সাজুকে প্রায় তিন ঘন্টা হ্যালুসিনেশ দেশে ঘুরিয়ে আনলো। সে এখনো ঝিমে আছে। তার চোখ দিয়ে বিন্দু মাএ পানি বের হয় নি। খুবই নিষ্ঠুর পর্যায়ের মানুষ লোকটো। গভীর রাত এখানে এখন। প্যাচার ডাক শুনতে পারছি মাঝে মাঝে। আমার ভিতরে কেমন এক পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছি। কারন ছাড়া রাগ লাগছে সাজুর উপর, ইচ্ছে করছে তার গলা চেপে ধরি। না গলা চেপে না, তাকে কিছু দিবে মেয়েজর মাথা



ফাটিয়ে দেই। সাজু একটা হারামি, মারাত্মক হারামি। তার মত আমার এক হারামি চাচা ছিল। আমার মা আর আমি তাদের বাসায় থাকতাম। বাবা ছোট বেলাতে মারা গেলেন। বাবা দেলোয়ার চাচার সম্পর্কে বন্ধু ছিল। তাই দেলোয়ার চাচার বাসায় থাকার অনুমতি পেলাম আমরা। আমাকে মা প্রতি রাতেই বলতেন, এই যে বাপধন, ‘কার জন্যে এত খাটি বলেন তো, আপনার জন্যে। পড়ালেখা করতে হবে আপনার। আপনার বাপের কিছু জমিন আছে, সব কাগজ আপনার দেলোয়ার চাচার কাছে। টাকাও আছে ব্যাংকে। এখন ব্যাংক থেকে সব টাকা শেষ করলে হবে, হবে না। তাই আপনারে পড়ানোর জন্যে খাটতেছি, বুঝলেন?’ আমি মাথা ঝাকিয়ে বলতাম, বুঝেছি। মাকে দেলোয়ার চাচা তার একটা ব্যবসা দেখতে দিয়েছিলেন। দেলোয়ার চাচার কোন সন্তান ছিলো না। তবুও লোকটা খুব টাকা চিনতো। একদিন আমাদের কাছে আসলো, আমাকে বলল -‘বাবা তুমি একটু ঘরে যাও, তোমার মার সাথে কথা বলবো।’ আমি ঘরে চলে গেলাম। চাচা মাকে বলতে লাগলো -‘বুইডি, আমার একটা উপকার করতে হবে তোমার। তোমাগো উপকার করতে করতে আমি তো ক্রান্ত হয়ে গেছি।’

মা বলল -‘এজন্যে তো তার কাছে আপনার জন্যে দোয়া করি দাদা। বলেন, কি উপকার করা লাগবে?’

-‘তোমারে কালকে আমার একটা ব্যবসায়ী বন্ধু দেখছে। তোমার খুব প্রশংসা করছে তিনি। কিন্তু, ক্যাচাল অন্য জায়গায় বুইন। তার সাথে আমি নতুন একটা কাজ করতে চাইতেছি, লোকটা কিছুতে রাজি হইতেছিল না। আজ রাজি হয়ে গেল, তাও আবার তোমার জন্যে। আল্লার রহমত দেখছ, বুইন।’

-‘হ্যা দাদা, তার রহমত আছে। আমাকে কি করতে হবে বলুন, আমি করে দিব।’

-‘তেমন বড় কিছু না বুইন, তুমি শুধু তার বাসায় এক রাইত থাকবে। তার আবার বউয়ের অসুখ, হাসপাতালে ভর্তি। পুরুষ মানুষ বোঝো তো বুইন, কত দিন পারা যায় একা। পারবা না, বুইন?’

আমার মা রেগে উঠলেন। দেলোয়ারকে পারলে ঘাড় ধরে ধরুক, কিন্তু তা মা পারছে না। শুদ্ধ ভাষায় বললেন -‘দাদা, আপনি আসতে পারেন। কাল আপনার বাসা থেকে আমরা চলে যাবো। আপনার বন্ধুর যে জমিনের কাগজপত্র আছে, দয়া করে আমাকে দিয়ে দিবেন।’



দেলোয়ার হাসতে হাসতে বলল - ‘কিছু নাই বুইন, সব আমার কাছে বিক্রি করছে। আপনাগো আমার বাড়ি রাখছি মানবতার খাতিরে। তবে একটা কথা, যদি কাল রাতে আপনি যান, তবে কাগজ দিব না-কি তা ভেবে দেখতে পারি। তাহলে আজ আমি যাই বুইন, কাল সকালে আমাকে আপনার মতামত জানাবেন। রাতে বসে ভাবেন। হায় হায়, আসল কথা বলতে ভুলে গেছি, আপনার পোলারে ভাল একটা কলেজে ভর্তিও করাই দিব। ঢাকার কলেজে পরবে, ভাসিটিতে যাইবে। এহন ভাবেন, আপনার মতামত কি আমাকে জানাবেন, আসি বুইন।’

সেদিন মা আমাকে ধরে সামস্ত রাত কাঁদলেন। আমি বোঁকা ছিলাম বলে দেলোয়ার বেঁচে গেলো। কোন উপায় পেলেন না মা, তাই পরের রাত কাটালেন দেলোয়ারের বন্ধুর বাসায়। আমাকে বলে গেলেন, রাতে খুব জরুরি কাজ, তাই বাসায় ফিরবেন না। দেলোয়ার মাকে চাপ দিয়ে বাজে কাজ করাতে লাগলো। মা আমাকে ঢাকায় ভর্তি করে দিলেন। বড় এক বাসা ভাড়া করে দিলেন। আমি সেই বাসার একমাএ বাসিন্দা, আর কেউ নেই। আমার গ্রামে যাওয়া বন্ধ, মা নিজেই আমাকে দেখতে আসেন। প্রতিবার বলেন, ‘শোন বাবা, তোমার জন্যেই আমার এত কষ্ট করা। ভাল করে পরবা, আর গ্রামে যাবার চিন্তা মাথায় আনবা না। লাট সাহেব যেদিন হবা, সেদিন আসবা।’ আমার প্রতিবার বলতে ইচ্ছা করতো, মা, আমার জন্যে কষ্ট করা লাগবে না। তুমি আমার কাছে থাকো, আমি লাট সাহেব হতে চাই না। আমি আমার মাকে চাই, তার বুকে ঘুমাতে চাই। কখনো বলতে পারলাম না কথাটা। একদিন মায়ের একটা চিঠি আসলো আমার কাছে। চিঠিটা মার হাতেই লেখা-

“শুভ কামনায়”

প্রিয় বাবা,

তুমি কি আমার উপর খুব রাগ? মায়ের উপর রাগ করে থাকবা না। তোমাকে অনেক দেখতে ইচ্ছা করতেছে। আমি আর হয়তো তোমার সাথে দেখা করতে পারবো না। দেলোয়ার আমাদের ঠকাইছে বাবা। তাকে আমি খুন করে ফেলছি। চাপাটি দিয়ে কুঁপিয়ে খুন করেছি, বাবা। আমি এখন জেলে



আছি। তবে কোন জেলে, তা তোমাকে বলবো না। আমি জানি তুমি তাহলে চলে আসবে। আমি চাই না তুমি এখানে আসো। তুমি ভাল করে পড়বা বাবা, আমাকে নিয়ে ভাবা লাগবে না। যদি ফাঁসি না হয় তাহলে তোমার সাথে আবার দেখা হবে, বাবা। তোমার জন্যে অনেক টাকা রেখে দিছি ব্যাংকে। তুমি পড়ালেখা চালিয়ে যাবে, খবরদার গ্রামে যাবা না। তোমাকে ওরা খুঁজে পেলে মেরে ফেলবে। বাবা, তোমার মাকে তুমি মাপ করে দিও, যা করেছি সব তোমার জন্যে। আমার তো আর কেউ নেই, তুমিই আমার সব। তুমি কান্না করবা না কিছু চিঠি পড়ে। তোমাকে একটা ডায়েরি দিয়ে গেলাম, তোমার বাবা নিজের হাতে লিখেছে। তোমার যখন আমাদের কথা মনে পরবে, ডায়েরি পড়বা। এখানে আমাদের সবার কথা লেখা আছে। তোমার বাবার আর মার প্রেম কাহিনীও লেখা আছে, তুমি পড়বা আর হাসবা। তুমি কখনো কাঁদবা না, মনে থাকে যেন। আর একটা কথা, তুমি গরীবের সম্ভান, তাই নিজেকে গরীব ভাববে না। মনে করবা, তুমি অনেক ধনী। কারন, নিজেকে গরীব ভাবলে, মন ছোট হয়ে যায়। বাবা, আমার ফাঁসির আদেশ না হলে তোমাকে আরো চিঠি দেবো। যদি চিঠি না পাও, তাহলে ভাববা তোমার মা মায়া কাটাইতেছে। ভালো করে পরবেন বাবা, আর ঠিক করে খাওয়া দাওয়া করবেন। আপনাকে আমি অনেক ভালবাসি। মাকে ক্ষমা করে দিয়েন।

ইতি

তোমার মা

কাঁদলাম, এমন কাঁদা কেউ কাঁদে নি। মাকে দেখতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু কিভাবে দেখবো? চিঠির উপরের ঠিকানার জায়গায় গেলাম। কিন্তু সেখানে যিনি থাকতেন, তিনি এখন থাকেন না। মায়ের চিঠিটা তবে কিভাবে এলো, তাও বুঝলাম না। অনেক জেলে খুজলাম মাকে। আবার তার চিঠির অপেক্ষা করতে লাগলাম। মা আর চিঠি দিলেন না। আস্তে আস্তে মাকে ভুলে যেতে লাগলাম।

দেলোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট সাজু। দেলোয়ারকে সেদিন আরতে পারি নি, যদি পারতাম তবে মাকে হারাতাম না। সাজুকে মারবো, তার বেঁচে থাক। আমি মাপকে বাঁচিয়ে রাখা। সাজু চোখ খুললো, তার নেশা কেঁটে গেছে হয়তো। দে-জর কোন নিয়ে কাকে যেন কল করতে চাচ্ছে। বিস্তীর্ণ জালিকা এখানে আপ ডাউন করে



একটি কল করতে পারা মানি, মোহরের অধিকারী হওয়া। সাজু আমার দিকে তাকালো। হ্যালুসিনেশন কাজে লেগেছে, সাজুর চোখে ভয়। আমি সাজুকে বললাম - ‘সাজু, আপনি কি আরেকটু খাবেন? আপনার নেশা হয়তো চলে গেছে।’

সাথে সাথে বলল - ‘না না, আর খাবো না। আপনি আমাকে হ্যালুসিনেশনে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার সব কথা জানার জন্যে, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলে এখানে এনেছেন। কাজটা আপনি ঠিক করেন নি, একদমই ঠিক করেন নি। আর এখানে নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না কেন? আমি একটা ফোন করবো।’

আমার কথা কেমন যেন করে বের হচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম - ‘কাকে ফোন করবেন আপনি, বাসায় ফোন করবেন? মাওয়ার বাবাকে বলবেন, আপনি এখানে। আপনি তো ফোন করতে পারবেন না, সাজু। আজ আপনার ফোন করা নিষেদ। দিন, ফোনটা আমার কাছে দিন।’

- ‘আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন? ভালো করে কথা বলুন। আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। আপনি আমাকে বাসায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিন।’

- ‘আর বাসায় যেতে পারবেন না আপনি, আপনার মত পাঁপীদের ফাঁসি দেয়া উচিত। নাহ, আপনাকে ফাঁসি দেব না। মাওয়াকে যেভাবে মেরেছেন, ঠিক সেভাবে মারবো আপনাকে।’

সাজু উঠবার চেষ্টা করলো কিন্তু নেশা তাকে দুর্বল করে রেখেছে। আমি তাকে আঘাত করলাম। চলার এক আঘাতে সাজু অজ্ঞাণ হয়ে গেল। সাজুর হাত, পা, মুখ বেঁধে দিলাম। গরম পানি ঢালবো তার দেহে, তাকে ঠিক মাওয়ার মত করেই মারবো। আমার মাঝে এক সন্তার জন্ম নিয়েছে। আমি তাকে চিনতে পারছি না। তাকে কন্টল করাও আমার পক্ষে সম্ভব না। কে এই সন্তা, গুরু নয় তো? সাজুর গায়ে টকবগে গরম পানি ঢেলে দিলাম। তার শরীর খঁসে পরতে লাগলো। সাজুর দাপাদাপি দেখে মনে হচ্ছে, সে ক্ষমা চাচ্ছে। আমি তাকে ক্ষমা করার ফেউ না, মাওয়া তাকে ক্ষমা করবে, আব্দুল ছত্তার তাকে ক্ষমা করবে, এই পৃথিবী তার ক্ষমা করবে। আমার কাছে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। সাজুর পায়ে দড়ি বেঁধে নদীর দিকে যেতে লাগলাম। কেন যাচ্ছি, আমি তো যেতে চাইছি না, আমাকে কে যেন নিয়ে যাচ্ছে, মাথার ভিতর কে যেন ভর করে বসে আছে। আমি চাইলেও সাজুকে ছেড়ে দিতে পারছি না। সাজুকে নদীতে ফেলে দিলাম। তার ভয়ে মাওয়ার বুদ্ধ বুদ্ধ শব্দ আমার কানে আসতেই, মনে হলো আমি কি



করছি। একটা মানুষকে মেরে ফেলছি কেন? আমি সাজুকে তুলতে বাঁপ দিতে গেলাম, কিন্তু দেহের ভিতরের সত্তাটা আমাকে আবার বাঁধা দিল। নেশায় আমার মাথা উন্মাদ হয়ে আছে, কি করছি বুঝতে পারছি না। সাজুর চিন্তা নেই আর, ধীরে ধীরে আমার উঠনে চলে আসলাম। শরীর ক্রান্ত হয়ে গেল। আমি উঠনে পাঁ গেড়ে বসে পড়লাম। সত্তাটা নেই আমার মাঝে এখন, আমার আমি ফিরে এসেছে। কান্না করতে লাগলাম। আমি কি করলাম এটা, একজন মানুষকে খুন করে ফেললাম। কে যেন আমাকে ডাকছে, কে ডাকছে আমাকে? লোকটা আমার নাম ধরে ডাকছে, বলছে - 'এই নিতাই রায়, তুই কান্না করছিস কেন?'

- 'কে, কে ডাকছেন?'

- 'তোর নাম ধরে আর কে ডাকতে পারে, আমি ডাকছি, তোর গুরু ডাকছি।'

- 'গুরু, কে গুরু। আপনি এসেছেন, আপনি কোথায় গুরু, আমি তো আপনাকে দেখতে পারছি না।'

- 'আমাকে তো দেখা যাবে না নিতাই, আমি তো কেবল মানুষের ভিতরে থাকি। তাদের শান্তি দেই, গভীর শান্তি। তুই আমার সবচাইতে প্রিয় শিষ্য, তাই তোর সাথে কথা বলছি আমি। বল, তুই কান্না করছিস কেন? আমার শিষ্যরা তো কান্না করবে না, তাঁরা হাসবে, কেবলই হাসবে।'

- 'গুরু, আমি কাজটা খুব খারাপ করেছি। আপনার ভর সহ্য করতে পারি নি। আমি এখন খুনি নিতাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

- 'বৌকার মত কথা বলবি না, তুই খুনি হতে যাবি কেন। তুই যা করেছিস সেটাই ঠিক, আমার শিষ্যরা যা করবে তাই ঠিক। তাঁরা হলো এই পৃথিবীর রাজা। নিতাই, একটা কথা মনে রাখবি, এই পৃথিবীতে যা করবি তাই প্রকৃত কর্ম, আর যা করবি না তা কর্ম নয়।'

- 'কিন্তু গুরু, আমি যে আপনার সত্যিকারের শিষ্য হতে পারলাম না। আমি যে আপনাকে ব্যবহার করে খুন করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।'

- 'কে বলেছে, হতে পারিস নি? তুই আমার শিষ্য হতে পেরেছিস। আমি তাদের সাথেই কথা বলি, যাঁরা আমাকে পাবার জন্যে গ্রহন করে। অর্থাৎ কাউকে বলি না, আমাকে গ্রহন করো। যাঁরা নিজ ইচ্ছায় আমাকে গ্রহন করে, তাঁরাই আমার শিষ্য। কিন্তু নিতাই, তুই তাদের মধ্যে সবচাইতে ভাল শিষ্য। তুই খুনি না, তুই শিষ্য।'



গুরু চলে গেলেন। তিনি ঠিকই বলেছেন, পৃথিবীতে যা করবো তাই কর্ম। এর মানি, আমি নেশা ছেড়ে দিতে চাইলে এটাও কর্ম। মানি, তাকে ছেড়ে দেয়াটাও ঠিক। কিন্তু আমি তো তাকে ছাড়তে পারবো না। নেশা বলেছে, আমি তার সত্যিকারের শিষ্য। সত্যি শিষ্য গুরুকে কিভাবে ছাড়বে। সাজুর জন্যে খারাপ লাগছে, এভাবে আর খুন করা ঠিক হবে না।

সকালে বাবার ডায়েরিটা খুললাম। আমি কখনো এটা পড়ি নি। যেদিন মা চিঠি দিয়েছিল, সেদিন উপরের পাতা নড়াচড়া করেছিলাম মাএ। আমার ছোট বেলার ছবি, বাবা-মায়ের ছবিগুলো একবার দেখেছিলাম। আজ ডায়েরির শেষের কিছু পাতা পড়বো। বাবা শেষ করে যেতে পারেন নি, মা লিখে শেষ করে গেছেন। আজ শেষের পাতাটা পড়ছি-

“শুভ কামনায়”

নিতাই, আমি জানি তুমি অনেক বড় হবে। তোমার জন্যে ভগবানের কাছে সব সময় প্রার্থনা করি। তোমার মা কিন্তু খুব দুঃখি ছিলেন, তুমি হয়তো বড় হলে বুঝবে। যখন তুমি বুঝতে পারবে, তোমার মা কেন দুঃখি ছিলেন, তখন ভাববে তুমি বড় হয়ে গেছো। আমি তোমাকে চিঠিতে যা যা লিখেছি, তা সবটাই সত্য। কিন্তু মিথ্যাটা হলো, আমার ফাঁসি হবে না। কারন, আমাকে বলাই সেন নামে একজন জেল থেকে বের করে নিয়েছেন। তিনি সন্ত দিয়েছেন, তাকে বিয়ে করতে হবে। বাবা, আমি নিরুপায় ছিলাম। চিঠিতে এসব কথা লিখতে পারতাম, তাহলে তুমি আমাকে খুব ঘৃণা করতে। আমি চেয়েছিলাম, আমার নিতাই আমার জন্যে মাএ একবার চোখের পানি ফেলুক। চিঠি পড়ে তুমি যে চোখের পানি ফেলেছো আমি জানি, তার সাথে এটাও জানি আমাকে অনেক খুঁজেছো। আমি বলাই সেনের সাথে কলকাতায় চলে এসেছি, বাবা। নিতাই একটা কথা, তুমি নেশা করবে না কখনো। সবাই নেশার মাঝে ডুবে মরছে। শত খারাপ কাজ করলেও, তাদের মনে হয় তাঁরা ঠিক। আমাকেই দেখো, আমি নেশার আসক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে কখনো বলি নি কথাটা। নেশা করেই দেহোত্তমকে খুন করেছি। বাবারে, নেশা খুব খারাপ বস্তু। একবার যদি মজা পেরে যাও তোমারে খাইয়া ফ্যালাইবে।



বলাই সেন কে শুনতে চাও, সে হলো দেলোয়ারের বন্ধু। দেলোয়ার যেমন তোমার বাবারে ঠকাইছে, বলাই সেনও দেলোয়ারকে ঠকাইছে। কিন্তু তোমাকে আমাকে ঠকায় নাই সে। তোমার জন্যে, অনেক টাকা ব্যাংকে দিয়ে দিছেন। আমি তাকে বলছিলাম, আমার নিতাই বাবারে নিয়ে আসি। সে বলল, তুমি নাকি তাকে কখনো বাবা বলে মেনে নিবা না, তাই সে বারন করলো। আর তোমার সুখের কথা ভেবেই, আমি মিথ্যা চিঠি লিখেছি বাবা। তোমাকে যে চিঠিটা দিয়েছি, সেটা লিখেছি কয়বার শুনবা, কম করে হলেও চল্লিশবার। যতবার লিখতে বসছি, ভিজে গেছে জলে। শেষে তোমার বলাই বাবা লিখে দিয়েছেন। সে আবার হাতের লেখা ভাল নকল করতে পারে।

নিতাই, তুমি কিন্তু ভাল করে, খুব ভাল করে পড়বে। এই লেখাগুলো পড়ার পরে তুমি হয়তো আমাকে ঘৃণা করতে থাকবে। এমনও হতে পারে, তুমি আমাকে আর মনে করবে না কখনো। কিন্তু নিতাই বাবা, তোমার মাকে মাপ করে দিও পারলে। তুমি যেই চিঠিগুলোর অপেক্ষায় ছিলে, সব চিঠি একসাথে পেয়ে গেলে। তাই বাবা, প্রথমটা পড়ে ডায়েরি ছিঁরে ফেলো না, চিঠিগুলো পড়ো। কলকাতার ঠিকানা দিয়ে দিলাম, যদি দেখতে ইচ্ছে করে চলে এসো।

তারিখ-১০/০৮/১৯৮৮

বিঃদ্র -নিতাই বাবা, আপনাকে অনেক ভালবাসি।

ডায়েরি পড়ে অনেক নতুন কিছু জানতে পারলাম। মা নেশায় আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। মা, তুমি বিয়ে করেছিলে তাতে কি, আমি তো বারন করি নি। তোমার চলে যাওয়া ঠিক হয় নি। তোমাকে এখন খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু বেঁচে আছো তুমি মা? তোমার লেখটা আগে পড়লে হয়তো, নেশায় আসক্ত হতাম না আমি। তোমাদের সাথে থাকতেও পারতাম। আমাকে ক্ষমা করো মা, আমি নেশার পোঁকা হয়ে গেছি। নেশার কারনে মারা যাচ্ছি। নেশার কারনে মানুষও খুন করছি। তুমি কি বেঁচে আছো মা, আমি তোমার ঠিকানায় আসছি। মা, আপনাকেও আমি অনেক ভালবাসি।

সমাপ্ত



লেখক পরিচিতি-

আমি, আবদুল্লাহ আল আশিক তারেক শরীফ। বাবা-মা কখনো ভাবেন নি তাদের পুত্র লেখক হবে, তাই নামটা দীর্ঘ রেখেছেন ! তাদের মন ভাঙ্গাটা ঠিক হবে না বলে, দীর্ঘ নামের শেষের ও প্রথম শব্দযুগল নিয়ে নাম রাখলাম “শরীফ আবদুল্লাহ”।

সুতরাং, আমি শরীফ আবদুল্লাহ। জন্ম ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সনে বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের মাদারীপুর জেলার হরিকুমারিয়া গ্রামে নানার বাড়িতে। বাবা-মার বাধ্য সন্তান এবং বোনের অবাধ্য ভাই। এদের সবাইকে অনেক ভালবাসি। আইন নামক একটি বিষয়ে অনার্স করছি। দুরন্ত জটিল বিষয়টা, ইচ্ছে আছে আইন বিষয়ে মৌলবাদী হবার। লেখালেখি আমার নেশা, তাই প্রথম উপন্যাস “শিষ্য” নেশা নিয়েই লিখলাম।

